প্রকাশক: শিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এস্-সি
মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট
১৬-১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা
১৩৪২

প্রিন্টার: সুরেশচন্দ্র দাস এম-এ
অবিনাশ প্রেস
৪০ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র নাগ এম-এ, পি-এইচ্‌ডি

শ্রীচরণেষু

নিরালায়

হাজারিবাগ হইতে রাঁচি যাইবার পথে, এই দুই জেলার সীমান্ত ভাগে, বিখ্যাত দামোদর নদের তীরে, রামগড় নামে একটী বড় গ্রাম আছে। যে সকল সৌখীন বাঙালী প্রতিবৎসর পূজার শেষে কয়েক মাসের জন্য ছোটনাগপুরের এই সহর দুইটীকে স্বাস্থ্যের অন্বেষণে পিপীলিকার মত আক্রমণ করিতে থাকেন, তাদের অনেকের কাছে ইহার নাম সম্পূর্ণ অবিদিত হইলেও, যারা এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিতেছেন, তাদের সকলেই ইহার নাম জানেন। এই দুই সহরের ভিতর যে সকল সার্ভিসের মোটর যাতায়াত করিয়া থাকে, প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্য সেগুলি এখানে থামিয়া দাঁড়ায়। স্থানটী একটী পুলিশ ষ্টেশন ও গঞ্জ বিশেষ। চারিদিকে কয়েক মাইলের ভিতর যে সকল গ্রাম আছে, সে সকলের অধিবাসীবৃন্দ সপ্তাহে দুইবার এখানে মিলিত হইয়া জিনিষপত্র কেনা-বেচা করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানে খৃষ্টান মিশনারীদিগের একটী গির্জ্জা এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত একটী ক্ষুদ্র হাসপাতাল আছে।

গ্রামের চারিদিকেব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি সুন্দর। ছোট বড় নীল পাহাড়ের শ্রেণী মেখলাব মত ইহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, যেন পাহাড়ের ফ্রেমে একখানা গ্রামের ছবি আটকাইয়া রাখা হইয়াছে। সড়কের পাশে, নদীর কেবল উপরে, সরকারী কর্ম্মচারী ও মুসাফিরদিগের জন্য একটী বাংলো আছে। এই বাংলোর বারান্দায় দাঁড়াইয়া সম্মুখে চাহিলে, বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত শ্যামল বনশ্রী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। শৈলমালার অবস্থিতি অনুসারে এই চিরহরিতের প্রসার তরঙ্গায়িত হইয়া

ক্রমে দূরে, বহুদূরে অস্পষ্ট নীলাভ কুয়াসায় মিশিয়া গিয়াছে। গ্রাম হইতে অল্পদূরে বিখ্যাত চুটুপাল চড়াই, এবং তন্নিম্নে ঐ নামের বিস্তৃত উপত্যকা। এই নিস্তব্ধ নির্জ্জন বনভূমিতে, সরল, উন্নত শালের ছায়ায় টনিকের মত শক্তিপ্রদ শৈল সমীর সেবন করিয়া, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে মানুষের মন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়ে। নিমেষের জন্য আমরা সহরের কথা, সভ্যতার কথা, মানব সমাজের জটিল সমস্যাগুলির কথা—ভুলিয়া গিয়া এক কবি-কল্পিত, অপ্রাকৃত, চির সুষমাময় লোকে বিচরণ করিতে থাকি।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার এক বন্ধুর সহিত আমি রামগড়ের এই নদীতটবর্ত্তী ক্ষুদ্র ডাক বাংলোতে শীতের শেষের এক রাত্রি যাপন করিয়াছিলাম। সময়ের কত ব্যবধান; কিন্তু এখনো সমস্ত ঘটনাগুলি আমার স্পষ্ট মনে পড়িতেছে, যেন সেদিন ঘটিয়াছে মাত্র। সমস্ত গ্রামের ছবি চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেছে—সেই গিরিশ্রেণী যাদের গাত্রে শালগাছ ঠেসাঠেসি করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, সেই শুষ্ক শুভ্র অববাহিকা যার মাঝখান দিয়া শীতকালের শীর্ণ দামোদরের শীতল জলস্রোত একটী কৃষ্ণ রেখার মত নিতান্ত নিঃশব্দে আঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়া চলিয়াছে—জলস্রোতের উপর সেই পুল, তৎপার্শ্বে সেই ডাক বাংলো, সেই নির্জ্জন পথ,

সেই গ্রাম্য বস্তি, সমস্তই আমি আবার নূতন করিয়া দেখিতে পাইতেছি।

আমার মনে আছে—সেদিন আমরা "হুড্রু" নামক এ অঞ্চলের একটী প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম। যাইবার সময় আমরা সাইকেলে গিয়াছিলাম, কিন্তু আসিবার বেলা সাইকেলের চাকা ফাটিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে হাঁটিয়া ফিরিতে হইয়াছিল। আমরা দ্বিপ্রহর হইতে পথ চলিতে সুরু করিয়াছিলাম, এবং রাত্রের পূর্ব্বেই একটা ভাল আস্তানা পাইবার উদ্দেশ্যে চারিদিকের নব নব নয়নাকর্ষক অরণ্য-শোভা হইতে বলপূর্ব্বক দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া, দ্রুতবেগে দীর্ঘপদনিক্ষেপে মাইলের পর মাইল অতিক্রম করিয়া আসিতেছিলাম।

যখন রামগড়ে পৌঁছি, তখন সন্ধ্যাকাল। পাহাড়ের পশ্চাতে সমস্ত আকাশ রক্তিম করিয়া, একখানা প্রকাণ্ড স্বর্ণ থালার মত সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্ত যাইতেছিল। আমরা গ্রামের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি ছোট পাহাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া শীতকালের ক্ষুদ্র দিবসের এই মহিমাময় পরিণাম দেখিতে লাগিলাম। লোক লোকান্তর ব্যাপী সমস্ত নিস্তব্ধ নির্জ্জন পাহাড় ও প্রান্তরের উপর এই বর্ণ বিকাশ দেখিয়া মনে হইল যেন যামিনী-বধূ ললাটে সিন্দুরবিন্দু পরিয়া অনাগত বল্লভের আশায় পশ্চিমদিগ্বাতায়নে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। প্রায় দশ মিনিট কাল দাঁড়াইয়া আমরা

এই উজ্জ্বল সূর্য্যাস্ত দেখিলাম। দিক্‌দাহ ক্রমে পাণ্ডুর হইয়া আসিল। আমরা টিলা হইতে অবতরণ করিয়া আরো কিছুক্ষণ পথ চলিবার পর ডাক বাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

বন্ধু খানসামাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিহে, ঘর খালি আছে?"

খানসামা—সে একজন ছোট খাটো, প্রৌঢ় বয়স্ক, বাদামী রংয়ের মানুষ—রসুইখানার দ্বারদেশে বসিয়া একটা চীনা-মাটীর পিরিজে কতকগুলি পিঁয়াজের খোসা ছাড়াইয়া রাখিতেছিল। আমাদের প্রশ্ন শুনিয়া মুখ তুলিয়া উত্তর দিল—"হাঁ, হুজুর! সব ঘরই খালি। ভিতরে চলুন।"

এই বলিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাংলোর দিকে চলিল। আমরা সাইকেল দুখানা তার হাতে দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। সে-দুটীকে সে যথাস্থানে রাখিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—"হুজুর! আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?"

আমি উত্তর করিলাম—"হুড্রু থেকে।"

—"কোথায় যাবেন?"

—"হাজারিবাগ।"

—"সাইকেলে এসেছেন তবু হুজুরদের জামা জুতা এত ময়লা হয়ে গেছে কেন?"

—"সাইকেলে আসিনি হে! সাইকেলের চাকা ফেটে গেছে; হেঁটে এসেছি।"

—"তাহলে ত বহুৎ তক্‌লিফ্‌ হয়েছে।"

—"সে কথা আর বলতে!"

—"আপনারা মুখ হাত ধুয়ে বিশ্রাম করুন। আমি চা'র যোগাড় করিগে।"

দরদী প্রৌঢ় চা'র যোগাড়ে চলিয়া গেল। আমরা তার কথামত হাতমুখ ধুইয়া সুস্থ হইবার জন্য বাথরুমে প্রবেশ করিলাম। অনতিকাল পরে সে চার সরঞ্জাম সহ ফিরিয়া আসিল এবং একটি গোল মেহগিনি টেবিলের উপর দুইটি পাত্রে দুইটি মাম্‌লেট ও কয়েক টুকরা মাখম-দেওয়া-রুটী রাখিয়া পেয়ালায় চা ঢালিয়া দিতে লাগিল। এই অবসাদ অপহারী তরল তপ্ত পানীয় পান করিয়া আমাদের শরীর ও মনের সকল গ্লানি দূর হইয়া গেল। চুমুকে চুমুকে আমরা যেন পুনর্জ্জীবিতের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলাম।

শেষ চুমুক পান করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম এবং লঘু প্রদোষান্ধকারে দাঁড়াইয়া আরামে ধূম পান করিতে করিতে প্রকৃতির নৈশ শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলাম।

ধীরে ধীরে অন্ধকার অপসারিত করিয়া সম্মুখের বনানী-সমুদ্রের উপর দিয়া কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথির ক্ষয়িষ্ণু শশীর উদ

হইল এবং এই আকাশ-বিগলিত কলধৌত প্রবাহে প্রক্ষালিত হইয়া বন্ধুর গিরিগাত্র, শীর্ণ সরিৎরেখা, শ্যামল পল্লবদল, অববাহিকার শুভ্র বালুকারাশি সমস্তই এক অপার্থিব সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিতে লাগিল।

বন্ধু বলিলেন—"এমন প্রকৃতির নিকটে এলে মানুষের ভিতর একটা পরিবর্ত্তন না এসেই পারে না। আমাদের অজ্ঞাতসারে এই পরিবর্ত্তন ঘটে যায়। আমি নিজের ভিতর অনেকবার এ অনুভব করেছি আর মনে মনে প্রশ্ন করেছি, এই পাহাড়ে, এই বনে এমন কি ক্ষমতা লুকান আছে যা আমাদের এমনভাবে অভিভূত করে ফেলে? প্রকৃতির সম্মুখে এসে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্রতা অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে অনুভব করি, সেইজন্যই কি এমন হয়? কিংবা যে সকল প্রচণ্ড শক্তি মহাব্যোমে চির ঘূর্ণ্যমান অগ্নিকুণ্ড থেকে এই সব প্রাকৃতিক বস্তুর উদ্ভব ঘটায়, এই পর্ব্বত বন দেখে সে সকল বিষয় চিন্তা করতে করতে আমাদের চিত্ত বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে বলেই এমন ঘটে? তুমি কি কখনো এই পরিবর্ত্তন অনুভব করনি?"

তার এই প্রশ্নে আমাদের ভিতর একটি দার্শনিক আলোচনার সূত্রপাত হইল। দেড়ঘণ্টাকাল আমরা চারিদিকের সৌন্দর্য্য প্লাবিত পৃথিবীর কথা ভুলিয়া গিয়া

জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি যত সব অমীমাংসিত তত্ত্ব লইয়া কথা কাটাকাটি করিলাম।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় আহারে বসিলাম। সামগ্রী বেশী ছিল না—রুটী, আলুসিদ্ধ, ডিমের কারী আর দুই টুকরা-মাংস। কিন্তু তাতে কি আসে যায়! সারাদিনে যেরূপ পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধিত হইয়াছিলাম তাহাতে যে কোন প্রকার খাদ্য আমরা তৃপ্তির সহিত খাইতে পারিতাম।

আহারান্তে দুইখানা ইজিচেয়ারে শরীর এলায়িত করিয়া দিয়া আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। খানসামা নষ্ট সামগ্রীসহ এঁটো বাসন উঠাইয়া লইয়া গেল এবং নিজে আহার সমাধা করিয়া আধঘণ্টাকাল পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

বন্ধু কাৎ-করা-ঘাড় তাহার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন—কি হে খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছ?

—"আজ্ঞে হাঁ হুজুর।"

—"বেশ, তাহলে এস একটু গল্প করা যাক। তুমি এখনি ঘুমুতে যাবে না বোধ হয়?"

—"আজ্ঞে না"

গল্প সুরু হইল। দেখিলাম সে বেশ আলাপ-প্রিয় লোক। একবার সুরু করিয়া দিলে তার কুঞ্চিত ওষ্ঠাধর শব্দ তরঙ্গে কেবলি উঠিতে পড়িতে থাকে।

অনেক বাজে কথা বলিবার পর সে আমাদিগকে এই গল্পটি শুনাইল।

"প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে এইরূপ এক শীতের সায়াহ্নে মতিবাবু নামে একজন অজ্ঞাতকুলশীল বাঙ্গালী যুবক আমাদের এই গ্রামে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। এই বাংলোতেই, যেখানে আপনাদের শয্যা প্রস্তুত করা হইয়াছে, সেই ঘরেই তিনিও শয়ন করিতেন।"

এই বলিয়া সে নীরব হইল এবং সহসা কি যেন মনে পড়ায় "আসছি" বলিয়া বাহির হইয়া গেল। কিছুকাল পরে সে ফিরিল এবং একখানা পুরাতন সংবাদ পত্রের ভাঁজের ভিতর হইতে একটী ফটো বাহির করিয়া আমাদের হাতে দিয়া বলিল—"এই মতিবাবুর ফটো। দশবৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাকে ইহা উপহার দিয়াছিলেন।"

ফটোতে যে লোকের চেহারা দেখিলাম, তার বয়স আটাশ কি উনত্রিশ বৎসর হইবে। লাবণ্যময় প্রতিভা-দ্যোতক আনন—নির্জ্জনে পরিপুষ্ট, নিরালাপ্রিয় লোকের মুখে স্বভাবতঃ যে চিন্তিত গম্ভীর বিষণ্ণভাব ফুটিয়া উঠে, তাতে সেইরূপভাব বিদ্যমান। সুবিন্যস্ত চুলগুলি গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে শিরোদেশ হইতে কর্ণদ্বয় আবৃত করিয়া একেবারে কাঁধ পর্য্যন্ত নামিয়াছে। দীর্ঘ গ্রীবার উপর মস্তকটীকে অতি সুন্দর ভঙ্গিমার সহিত

ঈষৎ বক্রভাবে স্থাপিত করিয়া ফটো তোলা হইয়াছে। নাসিকা সু-উচ্চ, কপোলদ্বয় সামান্য টোল খাওয়া, চিবুকাগ্রভাগ সূক্ষ্ম, নেত্রদ্বয় অন্যমনস্কতায় পরিপূর্ণ, যেন দিবাস্বপ্ন দেখিতেছে।

বক্তা বলিতে লাগিল—"মতিবাবুর মত এমন অদ্ভুত লোক আমি জীবনে দ্বিতীয় দেখি নাই। পনেরো বছর বয়স হইতে এই ডাক বাংলোর কাজ করিতেছি। হামেসা কত সাহেব সুবা, কত চাকুরিয়া বাঙালী দেখিতেছি, কিন্তু এমন প্রকৃতির লোক কখনো আমার চক্ষে পড়ে নাই। যেদিন তিনি প্রথম এখানে আসেন, সেইদিনই তার আলাপে ব্যবহারে বুঝিলাম এ একজন সম্পূর্ণ নূতন ধরণের মানুষ। সাধারণতঃ লোকে এখানে অন্যত্র যাইবার পথে দু এক প্রহরের জন্য বিশ্রাম করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু তিনি আমাকে বলিলেন, কিছুদিন মনুষ্য সমাগম হইতে দূরে নির্জ্জনে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে বাস করিবার জন্যই তিনি এখানে আসিয়াছেন! অদ্ভুত কথা, শুনিয়া ত আমি অবাক! সন্ন্যাসীও নয়, শিকারীও নয়, তবে এই নির্জ্জন বাস কেন? সেই সময় দারোগাবাবুর মুখে শুনিতাম, সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অভিযোগে বাংলা মুল্লুকে ধরপাকড় চলিতেছে। আমার সন্দেহ হইল, তবে কি এ ব্যক্তি সেই ষড়যন্ত্রকারীদের একজন, পুলিশের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য

এখানে অজ্ঞাতবাস করিতে আসিয়াছে? কিংবা এ একজন নিরীহ, অনপকারী ব্যক্তি বাড়ী হইতে ঝগড়াঝাটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে মাত্র?

একদিন সকালবেলা চা ঢালিয়া দিতে দিতে সভয়ে প্রশ্ন করিলাম—"বাবু, আপনি কি বাড়ী থেকে ঝগড়া করে চলে এসেছেন?"

—"হঠাৎ তোর এ সন্দেহ হ'ল কেন রে?"

—"সকলেই তাই বলাবলি করে কি না, বলে তা না হলে কি উদ্দেশ্যে এখানে পড়ে আছে?"

—"ঝগড়া করে এলেই বা এখানে আসব কেন? আর কি যাবার যায়গা নেই? আমি ত প্রথম দিনই তোকে বলেছি, আমি এখানে বেড়াতে এসেছি। আমার এক বন্ধুর মুখে শুনিয়াছিলাম, তোদের এ অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ, তাই দেখার জন্য এখানে এসেছি। তাছাড়া বর্ত্তমানে আমি একখানা বই লিখছি। সেজন্যও আমার পক্ষে নির্জ্জন বাসের প্রয়োজন।"

"মতিবাবু যে শুধু নির্জ্জনে বাস করিতেন তাহা নয় নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কথাটী পর্য্যন্ত বলিতেন না।

প্রতিদিন প্রাতে চা পানান্তে, নবোদিত সূর্য্যের হেমকান্ত কিরণে, কর্কগাছের নীচে একখানা চেয়ারে বসিয়া তিনি তাহার

পূর্ব্ব কথিত পুস্তক রচনায় মনোনিবেশ করিতেন। কি লিখিতেন বলিতে পারি না, কিন্তু দেখিতাম তিনি ক্রমাগতই লিখিয়া যাইতেছেন, কাগজের সাদা পৃষ্ঠা দেখিতে দেখিতে কালো রেখায় পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে। মাঝে মাঝে তিনি লেখা বন্ধ করিয়া প্রাতঃসূর্য্যবিহসিত প্রকৃতির দিকে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিতেন; কখনো বা চেয়ার ছাড়িয়া ভাবনিমগ্নচিত্তে ইতস্ততঃ পাদচালনা করিয়া বেড়াইতেন, তারপর সহসা আবার চেয়ারে ফিরিয়া আসিয়া টেবিলের উপর ঝুকিয়া পড়িয়া লিখিতে সুরু করিতেন।

"দুই ঘণ্টাকাল এইরূপ ভাবে কলম চালনা করিবার পর, লিখিত কাগজের তাড়া সহ তিনি ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিতেন এবং পুনরায় এক পেয়ালা চা পানান্তে সিগারেট টানিতে টানিতে অলস পাদবিক্ষেপে বনাভিমুখে নির্গত হইয়া যাইতেন।

তার ফিরিয়া আসিতে দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া যাইত।

আহারের পর পুনরায় কিছুক্ষণের জন্য তিনি নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপবেশন করিতেন এবং পা দুইটা সম্মুখে ইজি চেয়ারের হাতলের উপর আড়াআড়ি ভাবে ছড়াইয়া দিয়া একখানা পুস্তক খুলিয়া ইহার ভিতর একরূপ বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ডুবিয়া যাইতেন। সেই সময় তার বৃহৎ চক্ষু দুইটী এবং মাঝে মাঝে পাতা

উল্টাইবার কালে সঞ্চালিত অঙ্গুলাগ্রভাগ ভিন্ন অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এমন নিশ্চল থাকিত যে তাকে দেখিয়া মনে হইত যেন চেয়ারে কোন মৃতদেহ কিংবা কোন প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে।

তারপর বেলা পড়িয়া আসিলে তিনি ভ্রমণে বাহির হইতেন। তখন তিনি সাধারণতঃ কোন পাহাড়ের উপরে উঠিয়া দিবাবসান শোভা নিরীক্ষণ করিতেন, নতুবা রাস্তা ধরিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত হাঁটিয়া আসিতেন। গ্রামের লোকে মনে করিত, তিনি একজন পণ্ডিত লোক, দুনিয়ার সকল জিনিষ সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান তার মস্তকের ভিতর সঞ্চিত আছে। তারা বলিত—"এ আদমী সব জানে।"—বলিত আর তাকে দেখিলেই সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া দাঁড়াইত।

এই সময় গির্জ্জার জন্য এখানে একজন পাঞ্জাবী পাদ্রী সস্ত্রীক বাস করিতেন। তিনি একজন বাঙালী মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পাদ্রী সাহেব যখন কলিকাতায় পড়াশুনা করিতেন, তখন তাদের পরিচয় হয় এবং পাঠ্যাবস্থাতেই তারা পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তার স্ত্রী সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মত রোগা কিংবা ফ্যাকাশে ছিলেন না। তার শরীরে স্বাস্থ্য ছিল, আননে জ্যোতি ছিল। বসন্তকালের সকালবেলা কাননে একটী সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল দেখিতে যেমন সুন্দর, তিনি সেইরূপ সুন্দরী ছিলেন। তার সুবিমল

ওষ্ঠাধরে সর্ব্বদা সুকোমল হাস্য লাগিয়া থাকিত, তার কালো কালো বৃহদায়তন চক্ষু দুইটীতে সর্ব্বদা যৌবন-বোধ-জাগ্রত লঘু হৃদয়ের অনাবিল আনন্দ সুষমা বিরাজ করিত। তার অঙ্গের বর্ণ বাসি মাখনের মত সামান্য হরিদ্রাভ ছিল—মাঝে মাঝে তিনি যখন একখানা অতি নীল শাড়ী দ্বারা এই লাবণ্যময় বর্ণপ্রসার বেষ্টন করিয়া স্বামীর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইতেন, তখন তাকে দেখিয়া মনে হইত ঠিক যেন—ঠিক যেন—মোট কথা আমার মত একজন অশিক্ষিত বর্ব্বর মানুষও তখন তার সেই হিল্লোলিত সৌন্দর্য্যের দিকে মুগ্ধ ভাবে না চাহিয়া থাকিতে পারিত না। আর কি চুলই তার ছিল—নিবিড়, কৃষ্ণ, কুঞ্চিত। কবরী স্খলিত করিয়া দিলে, সেগুলি আগুল্‌ফ লম্বিত হইয়া পড়িত। পাদ্রী সাহেবের স্ত্রীভাগ্য যে সুপ্রসন্ন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিন্তু এমন স্ত্রীলোকের যে এমন স্বামী কিরূপে পছন্দ হইয়াছিল বুঝি না। পাঞ্জাবীদের মত দীর্ঘ গৌরকান্তি চেহারা হইলেও, সুপুরুষ বলিতে আমরা যাহা বুঝি পাদ্রী সাহেব সেরূপ ছিলেন না। তার মুখাবয়বে এক প্রকার শুষ্ক রূঢ়তা ছিল, যা দর্শকের মনে অপ্রীতিকর ভাবের উদ্রেক করিত। তার কণ্ঠ এমন এক প্রকার কাংস্য ধ্বনিবৎ শব্দ করিত, যা শ্রোতার কাণে তার মিষ্ট কথাগুলিকেও অমিষ্ট করিয়া তুলিত। কড়া

শাসকদিগের চক্ষে সাধারণতঃ যেরূপ উগ্রদৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায় তার পিঙ্গলাভ চক্ষে সেইরূপ দৃষ্টি বিদ্যমান থাকিত। সর্ব্বোপরি তিনি ভালরূপে বাংলা বলিতে পারিতেন না।

একদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত কাল পরে বাজার হইতে কিছু আহার্য্য সামগ্রী কিনিয়া বাংলোর দিকে ফিরিয়া আসিতেছি। এমন সময় পাদ্রী সাহেবের বাড়ীর নিকটে পৌছিয়া সহসা আমি মতিবাবুর স্বর শুনিতে পাইলাম। বিস্মিত হইয়া সেইদিকে তাকাইবামাত্র দেখিতে পাইলাম একখানা শুভ্রবস্ত্রাচ্ছাদিত গোল বেতের টেবিলের সম্মুখে একখানা চেয়ারে মতিবাবু বসিয়া রহিয়াছেন, তার নিকট হইতে অল্প দূরে আরেকখানা চেয়ারে স্বয়ং পাদ্রী সাহেব এবং আরেকখানা চেয়ারে তার স্ত্রী বসিয়া। একজন ভৃত্য তাদের চা ঢালিয়া দিতেছিল। তাই পান করিতে করিতে তাঁরা আলাপ করিতেছিলেন। আমি সেস্থানে বেশীক্ষণ না দাঁড়াইয়া বাংলোয় ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রে মতিবাবু ফিরিয়া আসিলে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—পাদ্রী সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে বুঝি ?

—"হাঁ, আজ বিকালেই চুটুপালের দিকে বেড়াতে গিয়ে রাস্তায় তাদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তুই কি করে জানলি ?"

—"বাজার থেকে ফিরে আসার সময় আপনাকে পাদ্রী সাহেবের ঘরে দেখলাম।"

—"বেড়িয়ে ফিরবার সময় তার স্ত্রী ধরে নিয়ে গেলেন। আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কি করি?"

অপরাধের কৈফিয়ৎ দেবার সময় দোষী ব্যক্তির কণ্ঠস্বরে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, কতকটা সেইরূপ পরিবর্ত্তিত কণ্ঠে তিনি এই কথাগুলি বলিলেন। আমি বলিলাম—"ভাল করেছেন। মানুষ কি কখনো না মিশে, না আলাপ করে থাকতে পারে? আমি হলে তাদের সঙ্গে যেচে আলাপ করে নিতাম। এখানে ত তারাই একমাত্র শিক্ষিত লোক, যাদের সঙ্গে আলাপ করে আপনি সুখী হ'তে পারেন।"

—"হাঁ, পাদ্রী সাহেবের স্ত্রীটি আলাপে মন্দ নন। কোন প্রকার গোঁড়ামির ভাণ নেই, আর সেই জন্যই সকল বিষয় বুঝবার শুনবার একটা স্বাভাবিক আগ্রহ আছে। পাদ্রীর স্ত্রী যে অতটা উদার হবেন আশা করিনি।"

আমি গোপনে ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িয়া তার কথায় সায় দিলাম।

তখন হইতে প্রতি সন্ধ্যায় আমি তিন জনকে একত্রে বেড়াইতে দেখিতাম। পুরুষ দুইজন দুইপার্শ্ব রক্ষা করিতেন, মহিলাটী উভয়ের দিকে চাহিয়া হাস্যস্ফুরিত অধরে কথা বলিতে বলিতে মাঝখান দিয়া গজেন্দ্র গমনে অগ্রসর হইতেন। তারা হয় চুটুপালের দিকে যাইতেন, নয়ত কিছুক্ষণ পায়চারি করিয়া

পুলের উপর আসিয়া দাঁড়াইতেন। নিম্নে সঙ্কীর্ণ জলধারা শিলায় শিলায় কলতান তুলিয়া অন্ধকারে বহিয়া যাইত, উর্দ্ধে এই মনুষ্যত্রয়ের বাক্‌প্রবাহেরও বিরাম কিংবা অন্ত ছিল না। রাত্রি গভীর হইলে গৃহে ফিরিয়া তারা গীত বাদ্যের আলোচনা করিতেন। মতিবাবু ভাল বেহালা বাজাইতে পারিতেন,বোধ হয় তার স্বাভাবিক মৌনভাবের সহায়ক বলিয়াই তিনি এই যন্ত্রটীকে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। পাদ্রী সাহেবের স্ত্রী গান গাহিতেন আর মতিবাবু বেহালায় তার কণ্ঠের অনুসরণ করিতেন। মিষ্ট সুরলহরী ধীরে ধীরে বাতাসে উঠিয়া পুষ্পগন্ধের সহিত মিলিত হইয়া তারাঙ্কিত আকাশের তলে দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িত ; এমন কি বাংলোয় এই তরুঘেরা নির্জ্জন ঘরে প্রবেশ করিয়া তারা মাঝে মাঝে আমাকে অন্যমনস্ক করিয়া দিত। অনেক রাত্রে একটি তৃপ্তির হাসি মুখে লইয়া মতিবাবু বাংলোয় ফিরিয়া আসিতেন।

কিন্তু মতিবাবুর ভিতরেই যে শুধু পরিবর্ত্তন আসিয়াছিল এমন নহে। বাস্তবিক তার সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে, এই মহিলার নিষ্ক্রিয় জীবনেও যেন এক নূতনতর সুখের স্রোত নব নব তরঙ্গভঙ্গে প্রবাহিত হইতে লাগিল। তার নির্জ্জনে অতিযাপিত দিনগুলি পূর্ব্বে যেন খঞ্জ ব্যক্তির মত ধীর গতিতে মাটীতে পা ফেলিয়া চলিত, এখন যেন সেগুলি স্বর্ণপ্রভ

প্রজাপতির মত হাল্কা হাওয়ায় পাখা মেলিয়া উড়িয়া উড়িয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মতিবাবু অত্যন্ত খেয়ালী লোক ছিলেন, কখন কোন্ মুহূর্ত্তে তার মনে কি ভাবের উদয় হইত তার কোনরূপ স্থিরতা ছিল না। তার এই খেয়াল-প্রবণতা ছোঁয়াচে রোগের মত এই মানব-মিথুনের ভিতর সংক্রামিত হইল। তিনজনে একত্রে আজ এ বনে চড়াইভাতি করিয়া, কাল ঐ পাহাড়ের শিখরারোহণ করিয়া, অন্য একদিন গিরিবেষ্টিত কোন নিভৃত নূতন সুন্দর স্থান আবিষ্কার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মতিবাবু যা করিতে বলিতেন তা প্রতিপালন করিয়া, যা আচরণ করিতেন, তা অনুসরণ করিয়া মহিলা যেন অপূর্ব্ব আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেন। এ সকল বিষয়ে পাদ্রীর অত উৎসাহ লক্ষিত হইত না, কিন্তু উভয়ের পাল্লায় পড়িয়া সঙ্গে না গিয়া থাকিতে পারিতেন না। যদি কোনদিন সামান্য অমত কিংবা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিতেন, স্ত্রীর ধমকে তৎক্ষণাৎ পুনরায় তাকে সম্মতি দিতে হইত।"

এই বলিয়া বক্তা কিছুক্ষণ নীরব রহিল এবং মাথা নত করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। বাহিরে কোথাও কোন শব্দ ছিল না, এমন কি কর্ক গাছগুলির পাতা পড়ার শব্দও না। পকেট হইতে সিগারেট বাহির করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"তার পর ?"

"তার পর একদিন রাত্রে মতিবাবুর ফিরিতে অনেক বিলম্ব দেখিয়া পাদ্রী সাহেবের বাড়ীতে গিয়া যা দেখিলাম, তা আমাকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিল। শেষে যে একটা-কিছু ঘটিবে তা আমি পূর্ব্ব হইতেই আশঙ্কা করিতেছিলাম, কিন্তু এত শীঘ্র এমনভাবে আমি তাহা আশা করি নাই। দেখিলাম পাদ্রী সাহেব ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া কক্ষের মাঝখানে দাঁড়াইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছেন, তার বিস্ফারিত চক্ষু দিয়া অগ্নি নির্গত হইতেছে, শরীর কাঁপিতেছে, মুখে একটা ভীষণ হিংস্রভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তার একপার্শ্বে তার স্ত্রী ও অপর পার্শ্বে মতিবাবু—আবক্ষ মস্তক নত করিয়া ধৃত অপরাধীর মত পাংশু বদনে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

ব্যাপার কি জানিবার জন্য আমি বাড়ীর পিছনে ভৃত্যের গৃহে উপস্থিত হইলাম। সেও সেখান হইতে উদ্‌গ্রীবভাবে ঘরের দিকে চাহিয়া ভিতরে কি হইতেছে—তাহা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে ?"

সে যা বলিল তার মর্ম্ম এই। সেদিন প্রাতে পাদ্রী সাহেব বিশপের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য রাঁচি যাত্রা করেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া যান সেখান হইতে

পরদিন প্রাতে ফিরিবেন, কিন্তু সেইদিন বিকাল বেলাই তিনি সহসা ফিরিয়া আসেন। তার স্ত্রী সেই সময় মতিবাবুর সঙ্গে বেড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিরার পর চাবি দ্বারা তার স্ত্রীর ড্রয়ার খুলিয়া কি একটা জিনিষ অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি একটা খাতা (ডায়েরী) বাহির করেন এবং তাতে কি লেখা দেখিয়া সহসা উচ্চ স্বরে বলিতে থাকেন—“বটে! বটে! এতদূর! ওঃ! আশ্চর্য্য আমি আগে টের পাই নি।”—তারপর দ্রুতবেগে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যান ও আধঘণ্টাকাল পরে উভয়কে সঙ্গে লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসেন। তারপর কি হইয়াছে, তা সে ভাল করিয়া বলিতে পারে না।

আমি বলিলাম—“সহসা পাদ্রী সাহেবের এমন উত্তেজিত হবার কারণ তুমি কি মনে কর?”

সে বলিল—“যা মনে করি তা কি আর বলতে সাহস পাই? অনেকদিন ধরে আমি তা লক্ষ্য করে এসেছি।”

“কি লক্ষ্য করে এসেছ?”

“দুজনের সম্পর্কটা। আমাদের পাদ্রী অতি সরল বিশ্বাস-পরায়ণ প্রকৃতির লোক, তাই তার মনে কোন সন্দেহ হয় নি, নয়ত যে সকল কাণ্ড ঘটেছে, আমি কবেই ধরিয়ে

দিতে পারতাম, কিন্তু আমার কি কাজ মনিবের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে। আমি তার বেতনভোগী চাকর, আমার কর্ত্তব্য হচ্ছে তাদের ফরমায়েস পালন করা। তবে আমার মনিবের সরল বিশ্বাস দেখে মনে মনে তার জন্য আমার দুঃখ হ'ত। হায় বেচারী···জান একদিন আমি কি দেখেছিলাম? বোধ হয় সেদিন শনিবার। পাদ্রী সাহেব সকাল বেলা পাশের গ্রামে ধর্ম্মপ্রচার করতে গিয়েছিলেন। মহিলাও ঘরে ছিলেন না। স্বামী চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই তিনি মতিবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বাহির হয়ে গিয়েছিলেন। আমি হাতের সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করে ভাবলাম—দশটার আগে ত কেউই ফিরে আসছেন না, সমস্ত কাজও যখন শেষ করে রেখেছি, তখন বাকি সময়টা একটু রাস্তায় বেড়িয়ে আসি। সেদিন সকাল বেলাটা ভারী সুন্দর ছিল, শীতকালের সকাল বেলার মত মোটেই মনে হচ্ছিল না! বাতাসে বেশ একটু মিষ্ট গরমের আমেজ মাখা। আকাশে, মাটীতে পাহাড়ে বনে যেন বসন্তকালসুলভ দিনের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত। আমি পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হ'লাম, একটা, দুটা, তিনটা ছোট ছোট পাহাড় ডিঙ্গিয়ে বনের ভিতর এসে পড়লাম। ছায়াশীতল বনে পাদপ-খিলানের তলে অন্যমনস্কভাবে চলতে চলতে সহসা এক স্থানে এসে আমি

মানুষের হাসি শুনতে পেলাম। আমি থমকে দাঁড়ালাম। চারিদিকে চেয়ে অবশেষে আবিষ্কার করলম—অদূরে, নদীর বাঁকের কাছে, একটু অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত স্থানে দুইজন লোক বসে—কে তারা জান ?—মতিবাবু আর পাদ্রী সাহেবের স্ত্রী। তারা পরস্পরের গা ঘেঁসে আলিঙ্গনবদ্ধ হয়ে বসেছিলেন, আর বার বার পরস্পরকে চুমো খাচ্ছিলেন……

সে আরো কি বলিতে যাইতেছিল কিন্তু এমন সময় কক্ষাভ্যন্তরে একটা কোলাহল ও ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনা গেল। অনতিকাল পরে দরজা খুলিয়া গেল এবং সেই উন্মুক্ত দ্বার পথে পাদ্রী সাহেব মতিবাবুকে তার বলিষ্ঠ পাঞ্জাবী হস্তে গলাধাক্কা দিয়া গোলকের মত প্রাঙ্গনে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া বলিলেন—"আর কোনদিন আমার বাড়ীতে এস না।"

আঘাতের বেগে মতিবাবু নিমেষকাল ভূ-পতিত হইয়া রহিলেন। পরে উঠিয়া উচ্চ স্বরে বলিতে বলিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন—"আমি কখনো এমন অপমান সহ্য করব না, কখনো না…এ অপমানের প্রতিশোধ আমি নেবই নেব।"

এই বলিয়া তিনি ক্ষিপ্র গতিতে একরূপ ছুটিয়াই বাংলোর দিকে চলিলেন।

এই ঘটনার এক সপ্তাহের ভিতরেই একদিন তাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। প্রতিদিনের অভ্যাস মত সকাল বেলা চা পান করিয়া তিনি বনের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। একদিন, দুইদিন, তিনদিন চলিয়া গেল, চারিদিকের সমস্ত স্থানে আমরা পাতি পাতি করিয়া অন্বেষণ করিলাম,—কিন্তু কোথাও তার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। লোকে নানা অনুমান করিতে লাগিল, কেহ বলিল কোন বন্য জন্তু তাকে নিহত করিয়াছে, কেহ বলিল হয়ত তিনি কোন পাহাড়ে আরোহণ করিতে গিয়া পদস্খলিত হইয়া মারা গিয়াছেন, কেহ বা অন্যবিধ কারণ নির্দ্দেশ করিল। কিন্তু মহাশয়গণ, এ সকল অনুমান সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাকে খুন করা হইয়াছে। বুঝিলেন? তাকে খুন করা হইয়াছে। কারণ তার অন্তর্দ্ধানের পর হইতে পাদ্রী সাহেবের মুখে আমি সর্ব্বদা একরূপ চঞ্চল, পীড়িত বিবেকের ভাব অনুভব করিতাম এবং অনেকদিন গভীর রাত্রে বাড়ী ফিরিবার কালে নিস্তব্ধ, নির্জ্জন, গির্জ্জার ভিতরে বেদীর সম্মুখে তাকে নতজানু হইয়া মুদিত নয়নে প্রার্থনা করিতে দেখিতাম।”

এই বলিয়া বক্তা নীরব হইল। নির্জ্জনে অভিনীত এই

ক্ষুদ্র নাটকের কথা আমাদিগকে এমন অভিভূত করিয়া দিল যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলাম। অবশেষে সে আমাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল, আমরা শয়ন করিতে গেলাম। বন্ধু অচিরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু আমি বিছানায় শুইয়া সমস্ত কাহিনীটি আগা গোড়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটা প্রশ্ন আমার মনে উদিত হইল—যে গিয়াছে, সে ত গিয়াছে, কিন্তু এমন ঘটনার পরে সেই পাদ্রী কি সেই মহিলাকে নিয়া জীবনে পুনরায় সুখী হইতে পারিয়াছিলেন? ···অদূরে বনভূমি বায়ুবিহ্বল হইয়া দুলিতে লাগিল; বাংলোর চারিদিকে বাতায়ন রন্ধ্রে রন্ধ্রে আহত পবনের বেগে সন্ সন্ শব্দ উঠিতে লাগিল। আমার মনে হইল, এ যেন সেই অজ্ঞাতকুলশীল যুবকের অকৃত-প্রতিশোধ প্রেতাত্মার আকুল ক্রন্দন। এই পবন স্বনন, এই অজস্র বনকলগীতি শুনিতে শুনিতে অবশেষে ধীরে ধীরে কখন যে আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম, তাহা জানিতে পারিলাম না।

মৃত্যু

দিনান্তের গোলাপী আলোক ইস্পাতের রংয়ে রূপান্তরিত হইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পরিণত হইয়া আসিতেছিল।

জমিদার কন্যার বিবাহ উপলক্ষে সন্ধ্যার কিছু আগে দুপুর বেলার খাওয়া শেষ করিয়া, আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া পশ্চিমমুখী একটী বারান্দায় বসিয়া আলাপ করিতেছিলাম। অমিতাচার ও অপরিমিত আহারের ফলে কিরূপে কয়েকজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে, প্রথমে তাহা লইয়াই আলোচনা সুরু হয়। কিন্তু আলাপ-তরু অতি তাড়াতাড়ি পল্লবিত হইয়া উঠে, সুতরাং শীঘ্রই মূল বিষয় ছাড়িয়া সংসারে কে কোথায় কত রকমের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছে, তালিকাকারে সে সকলের বিবৃতি লইয়া আমাদের ভিতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়া যায়।

আমরা যখন আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য রোমাঞ্চকর মৃত্যুর কাহিনী বলিয়া পরস্পরের উপর দিয়া টেক্কা মারিবার চেষ্টা করিতেছিলাম, তখন ব্যবসায়ী সরোজ বাবু আমাদের অলক্ষিতে পিছনে দাঁড়াইয়া মন দিয়া সমস্ত কথা শুনিতেছিলেন। সকলের বক্তব্য শেষ হইলে তিনি সম্মুখে আসিয়া, একটা শূন্য চেয়ারের কাঁধটা দুই হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ঈষদানমিত দেহভারের সহিত বলিলেন— "আপনারা অনেকেই অনেক রকমের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন; আমি এতক্ষণ চুপ করে সেগুলি শুনেছি, কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে আমি যে কাহিনীটী জানি তার সমতুল্য আপনারা একটীও বলতে পেরেছেন বলে মনে হয় না।"

সরোজ বাবু একজন বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি। শিশুকাল হইতেই তিনি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন। তার ফলে নানা

শ্রেণীর নানা আচারের লোকের সংস্পর্শে আসিবার সুযোগ তার ঘটিয়াছিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়া শুনিয়া জীবনের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে পরোক্ষ ও অপরোক্ষভাবে তিনি মহার্ঘ্য জ্ঞান সম্পদ আহরণ করিয়াছিলেন। আর মাঝে মাঝে বন্ধুবান্ধবদের মজলিসে এই সম্পদ বিলাইয়া দিতেও তিনি ভালবাসিতেন। তার বাড়ীটীও ছিল যত রাজ্যের যত আজগুবি ও অদ্ভুত জিনিষের একটী মিউজিয়ম বিশেষ। যা সচরাচর দেখা যায় না, পাওয়া যায় না সেই সব জিনিষ সংগ্রহ করিয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখার তার এক প্রবল বাতিক ছিল। অমন একজন পাকা ব্যবসায়ীর এইরূপ মনের ঝোঁক দেখিয়া আমি অবাক হইয়া যাইতাম। নিজের কাজ করিয়া যতটুকু সময় তার হাতে থাকিত তার সবটুকুই তিনি ব্যয় করিতেন এই বাতিকের পিছনে। যদি কেহ তাঁকে জিজ্ঞাসা করিত—"আচ্ছা, সরোজ বাবু আপনি কি উদ্দেশ্যে আপনার এই বাতিকের পিছনে এত অর্থ ব্যয় করেন?"—তাহা হইলে তিনি হাসিয়া উত্তর দিতেন—"ভগবানের চেয়ে বেশী বাতিকগ্রস্থ আমি নই। বলতে পারেন তিনি কি উদ্দেশ্যে এত আড়ম্বরের সঙ্গে এই দুনিয়ার সৃষ্টি করেছেন? মশায় এই দুনিয়ার কোন মানে নেই, এই জীবনের কোন উদ্দেশ্য নেই। যে কোন একটা বাতিক আশ্রয় করে জীবনের দিনগুলি কাটিয়ে দেওয়া।" এইরূপ অসাধারণ প্রকৃতির লোক সুতরাং

তাঁর নিকট হইতে একটি অসাধারণ কাহিনী শুনিতে পাইব মনে করিয়া আমরা তাঁকে সেটি খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিলাম।

তিনি চেয়ারে বসিয়া পকেট হইতে একটি সিগারেট বাহির করিয়া সেটার সদ্গতি করিতে করিতে বলিলেন—

"যে গল্পটি বলিব, সেটি আমি একজন বন্ধুর কাছে শুনিয়াছিলাম। তিনি স্বয়ং গল্পের একটী চরিত্র সুতরাং উত্তম পুরুষে তাঁর ভাষায় সেটী বর্ণনা করিলেই ভাল হইবে আশা করি।"

[১]

আমার একজন বন্ধু ছিল। সে ছিল আমার প্রতিদ্বন্দী। আমরা উভয়ে একই মহিলাকে ভালবাসিতাম।

বিষয়টা আরেকটু পরিষ্কার করিয়া বলা ভাল।

উত্তরপাড়ায় গঙ্গার উপরে আমাদের একটি বাগান বাড়ী আছে তুমি তাহা জান। একবার আমি তোমাকে সেখানে নিয়াও গিয়াছিলাম। আমার সৌখীন পিতা তাঁর অবসর সময় সেখানে যাপন করিবার মানসে গৃহটি সযত্নে বহু অর্থব্যয়ে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যেখানে গৃহটি অবস্থিত সেখান হইতে চারিদিকের দৃশ্য দেখিতে বেশ মনোরম। সম্মুখে প্রশান্তবাহিনী কলনাদিনী গঙ্গা, পরপারে সৌধশুভ্রতাঙ্কিত

বনরেখা, তদ্দক্ষিণে মহানগরীর অদৃশ্যপ্রায় অস্পষ্ট কলেবর, দুইপার্শ্বে সরিদ্বরার সুদূর প্রসারিত তীরে কলকারখানার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অভ্রালিঙ্গিত বিরাট চিম্‌নী; দিকে দিকে সুন্দর ছোট জনপদ ও শস্য-স্নিগ্ধ ক্ষেত্ররাজি।

আমাদের এম-এ পরীক্ষার পর ফল বাহির হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়টুকু একত্রে নিরিবিলি সহরের কাছাকাছি অথচ প্রকৃতির সামীপ্যে কাটাইবার উদ্দেশ্যে আমি ও আমার সেই বন্ধু এই বাগান বাড়ীটিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম।

নিরালায় আমি সাধারণতঃ ম্রিয়মাণ হইয়া উঠি। কিন্তু বন্ধুটির খাতিরে সেবার আমি নিরালা জীবন বরণ না করিয়া পারিলাম না।

কথায় বলে 'বিপরীতে বিপরীতে মিলে ভাল।' আমাদের ক্ষেত্রে প্রবচনটি অতি সত্য হইয়াছিল কারণ ভাবে ধারণায় ও চরিত্রগত বিশেষত্বে আমরা যেন দুই মেরুপ্রদেশের জীব ছিলাম অথচ উভয়ের প্রতি উভয়ের একটা সস্নেহ আকর্ষণ ছিল।

আমার এই বন্ধুটিকে আমি কলেজের সতীর্থদিগের ভিতর হইতে একটি দুর্লভ পুষ্পের মত চয়ন করিয়া লইয়াছিলাম। সে ছিল একজন স্বপ্নালস প্রকৃতির লোক। নলিনীদলনিলীন দ্বিরেফের মত সে সর্ব্বদাই এক কাব্যরসসিঞ্চিত অতিদূর কল্পলোকে মজিয়া থাকিত। তা ছাড়া তার চরিত্রের আরো

একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—সে তার অতিরিক্ত খেয়ালপ্রবণতা। খেয়ালাতিশয্যের জন্যই পরিণামে সে—কিন্তু সে সব কথা পরে হইবে।

আমরা সেখানে সর্ব্বদা প্রতিবেশীদিগের নিকট হইতে দূরে দূরে বাস করিতাম। তখন আমরা মাঝে মাঝে পড়াশুনা করিতাম, কখনো বা সঙ্গীতাদির আলোচনা করিতাম কিন্তু অধিকাংশ সময় নদীর বক্ষে নৌকা ভাসাইয়া দিয়া উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

নদীর মত সুন্দর জিনিষ পৃথিবীতে অতি অল্প আছে আর নদীবক্ষে এই উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিয়া বেড়ানো যে কত সুখের তাহা আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতে পারিব না।

কোনদিন আমরা নদী উজান বাহিয়া চলিতাম। কখনো বা ভাঁটার অভিমুখে নৌকা ছাড়িয়া দিতাম। আমাদের চারিদিকে জলেস্থলে রৌদ্র খেলা করিত, আকাশে দ্বীপের মত মেঘ ভাসিয়া যাইত, দুই তীর হইতে গ্রামের ও শস্য ক্ষেত্রের গন্ধ বহন করিয়া বাতাস ছুটিয়া আসিত আর ছোট ছোট সাদা মাছের ঝাঁক নৌকার কাছে ভাসিয়া উঠিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিত। আমরা ধরিতে চেষ্টা করিলে ইহারা ডুবিয়া কিছু দুর গিয়া আবার নৌকার কাছে ভাসিয়া উঠিত। যেদিন বাতাস অনুকুল থাকিত সেদিন পাল্ তুলিয়া

দিতাম, পাল স্ফীত হইয়া আমাদিগকে বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিত। যেদিন সেরূপ থাকিত না, সেদিন মাঝি হাল ধরিত আর আমাদের একজন দাঁড় টানিতাম। সারাদিনের খাবার আমরা সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম। দুপুর হইয়া আসিলে কোন নিভৃত পল্লীঘাটে তরুপ্রচ্ছায়ে নৌকা বাঁধিয়া আমরা রান্না করিতাম, মাঝি গল্প করিত। সে কতপ্রকারের গল্প—তার নগণ্য জীবনের সুখদুঃখের হাসিকান্নার গল্প, সন্তানের ভালবাসার, স্ত্রীর প্রেমের গল্প, মহাজনের সুদের গল্প, জমিদারের অত্যাচারের গল্প। রান্না শেষ হইলে বহুক্ষণব্যাপী সন্তরণ কাটিয়া স্নান, তারপর খাওয়া। আমাদের আহার্য্যের কোনরূপ বৈচিত্র্য ছিল না, কিন্তু বেশ তৃপ্তির সহিত আমরা তাহা ভোজন করিতাম। তারপর আমরা তীরে উঠিয়া গাছের গোড়ায় হেলান দিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে বিশ্রাম করিতাম, মাঝি সেউতি দ্বারা নৌকার জল সিঞ্চন কার্য্যে লাগিয়া যাইত। অবশেষে অপরাহ্ন বেলায় আমরা নৌকা ছাড়িয়া দিতাম।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিত; তারপর রাত্রি, অসংখ্য তারা-ঝিল্‌মিল্‌ রাত্রি আমাদিগকে আবৃত করিয়া ফেলিত। তখন অন্ধকারে তারা-প্রতিবিম্বিত জলে ধীরে ধীরে নৌকা বাহিতে বড়ই আরাম লাগিত। বোধ হয় সারাদিনের মধ্যে ঐ সময়ই সকলের চেয়ে অধিক আরাম পাইতাম। নৈশ সমীর আমাদের

ললাট হইতে স্নেহস্পর্শে ঘর্ম্ম মুছিয়া নিত, গভীর নিস্তব্ধতায় দাঁড়ের আওয়াজ ও তরঙ্গের ধ্বনি মিলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতের সৃষ্টি করিত; আমরা অন্তরে এক বিপুল শান্তির অবতরণ অনুভব করিতাম।

আমাদের ফিরিতে অনেক রাত্রি হইত।

একদিন ঘটনাক্রমে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে ফিরিয়া আসিলে, সলিলস্পর্শী দীর্ঘ সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে আমরা দেখিতে পাইলাম আমাদের বাগানের মালী একজন তরুণী সমভিব্যাহারী বৃদ্ধ ভদ্র ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করিতেছে। তরুণীটির বয়স সতেরো আঠারো; একটু দীর্ঘাকৃতি, দীর্ঘগ্রীব এবং তন্বঙ্গী; চক্ষু দুইটি বৃহৎ এবং তড়িত্তরল; আননমণ্ডল একপ্রকার পাংশু-সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ; দাঁড়াইবার ভঙ্গিমায় একটি কমনীয় মনোজ্ঞ শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আমরা নিকটে গেলে—'এই যে বাবুরা এসেছেন'—এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন—'এ বাড়ীতে আপনারা থাকেন? আমি বলিলাম—'আজ্ঞে হাঁ।'

বৃদ্ধ—'আমি ভেবেছিলাম বাড়ীটি খালি। পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার কন্যাটির একবার এর ভেতরটা দেখার ইচ্ছে হল, তাই এই অনধিকার প্রবেশ।'

—'সেজন্য আপনাদের সঙ্কোচ বোধের কিছু নেই।'

বৃদ্ধ তখন সহাস্য বদনে প্রত্যেকটি কথা চিবাইয়া উচ্চারণ করিয়া আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরা পরিচয় দিলাম।

বৃদ্ধ নিজের পরিচয় দিয়া বলিলেন, তিনি আমাদের একজন প্রতিবেশী। তার কন্যার শরীরটি অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফলে কিছু অসুস্থ হইয়া পড়ায় ডাক্তারের পরামর্শ মত কিছু দিন যাবত তাঁকে লইয়া গঙ্গার উপরেই একখানা বাড়ীতে বসবাস করিতেছেন। কিন্তু এখানে তারা বড়ই একা বোধ করেন; একে বাঙ্গাল, তাতে ব্রাহ্ম বলিয়া এখানের লোকেরা তাদের সঙ্গে বড় বেশী মেলা-মেশা করেন না, সে জন্য নিঃসঙ্গতার দুঃখে গঙ্গার হাওয়ায় কন্যার স্বাস্থ্যেরও আশানুরূপ উন্নতি হইতেছে না।

বাগানে পায়চারি করিতে করিতে তিনি আমাদিগকে এই সমস্ত কথা বলিতেছিলেন, আমরা তাহাদিগকে অভ্যন্তরে লইয়া গেলাম। মহিলাটি—(কথায় কথায় জানিতে পারিলাম তার নাম মানসী)—কক্ষের প্রাচীর সংলগ্ন বিচিত্র আলেখ্যাদি ও এই নিরালা পুরীতে আমাদের নির্জ্জন জীবনের কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

অবশেষে তারা বিদায় লইলেন। আমরা গেট্ পর্য্যন্ত

তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিলাম। ফিরিয়া আসিতে আসিতে বন্ধু আমার হাত টিপিয়া বলিল—

'এইরূপ একটি মেয়েকে ভালবাস্‌তে সাধ যায়!'

আমি হাসিয়া উত্তর দিলাম—'দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই প্রেমোদ্গম?'

কিন্তু কথাটা হাসিয়া বলিলেও সেই হাসির পশ্চাতে আমার মনের এক অতিদূর নিভৃত-কোণে একটি গোপন-ব্যথা সঞ্চারিত হইয়া উঠিল। বুঝিলাম যে ছিল এতদিন আমার বন্ধু, সে আজ আমার প্রতিদ্বন্দ্বীও বটে।

[২]

সাতদিন অতীত হইল। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ ও তার কন্যার সঙ্গে আমাদের আর সাক্ষাৎ হয় নাই, এমন কি একটা দৈবাগত কাজে আমরা এতদূর বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাদের কথা আমরা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, এমন সময় আবার একদিন তাদের সঙ্গে গঙ্গা-পুলিনে দেখা হইয়া গেল।

বৃদ্ধ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া সাশ্চর্য্যে বলিলেন—'বাঃ আপনারা এখানে আছেন অথচ আমাদের ওখানে যান না যে? আমি একদিন আপনাদের ওখানে গিয়ে গেট্‌ বন্ধ দেখে ফিরে এসেছি। ভেবেছিলাম আপনারা চলে গেছেন।'

—'না, তবে একটা কাজে একটু বিব্রত ছিলাম, তাই

বিশেষ অবসর না থাকায় আপনাদের খবর নিতে পারি নি।'

—'ও, তাই নাকি? আচ্ছা এখন্ থেকে যাবেন।'

—'হাঁ, তা যাব।'

তারপর আরো কিছুকাল সেখানে দাঁড়াইয়া তাদের সঙ্গে আলাপ চলিল। আমি লক্ষ্য করিলাম বন্ধুটি আমার অন্তরালে দাঁড়াইয়া মুহুর্মুহু মহিলাটির দিকে ক্ষিপ্র, চকিত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। অবশেষে বিদায়কালে পুনরায় মহিলাটি আমার দিকে চাহিয়া স্মিতাধর কম্পিত করিয়া বলিলেন—

—'যাবেন কিন্তু।'

—'নিশ্চয়।'

সেদিন বন্ধু আর আমার হাত টিপিল না, কথাও বলিল না। অত্যন্ত বিমর্ষভাব তাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

তখন হইতে প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমরা দুই বন্ধু বৃদ্ধের গৃহে সমবেত হইতে সুরু করিলাম। সেখানে গঙ্গামুখী একটি আসবাব-বিরল কক্ষে বসিয়া পিতাপুত্রীর সঙ্গে আমাদের আলাপ আলোচনা হইত। আমাদের পক্ষ হইতে আমি ও অপর পক্ষ হইতে মানসী অবিরাম প্রশ্নোত্তর দ্বারা আলাপ-ধারা সতত প্রবহমান রাখিতাম। মানসীর মন্তব্যগুলি বিশেষ প্রতিভাদ্যোতক না হইলেও তার আন্তরিকতা ও তার নব-যৌবনের জন্য আমি সেগুলি যথেষ্ট মনোযোগের সহিত শুনিতাম। বন্ধু বড় বেশী মাতিত না।

সে সাধারণতঃ হয় পরপারের প্রদীপ-খচিত বন-নীলিমার দিকে নতুবা যামিনী-ছায়া-কৃষ্ণ গঙ্গাবক্ষের দিকে উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত ও মাঝে মাঝে অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে দু একটা কথা বলিয়া পুনরায় নিস্তব্ধতার ভিতর ডুবিয়া যাইত।

বাড়ী আসিয়া এক একদিন আমি তাকে বলিতাম—'দেখ, তুমি আমাদের সঙ্গে আলাপে যোগ দাওনা কেন? আমরা আলাপ করি, আর তুমি সেখানে বোবার মত চুপ করে বসে থাক, সেটা কেমন লাগে।'

সে বলিত—'যারা ভাগ্যবান, তারাই আলাপ করুক। যার কোন আশা নেই, সে আর আলাপ করে কি কষ্টে!'

এইরূপে আমাদের সুকুমার সখ্য-প্রসূনে হিংসা-কীট প্রবেশ করিল। কথায় কথায় তার সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হইতে লাগিল। সুহৃদ্ভেদের আশঙ্কায় আমি তাকে বুঝাইয়া বলিতে চেষ্টা করিলাম যে সে একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ ব্যবহার করিতেছে, এ তার পক্ষে অনুচিত। সে যাকে প্রেম মনে করিতেছে, তাহা একটি আলাপী মেয়ের সাহচর্য্য-লিপ্সা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস করিত না।

অথচ হিংসা হইবার কারণ তার চেয়ে আমারই বরং অধিক ছিল। কারণ আমি অন্তরঙ্গভাবে মিশিয়া তার মনে

যে প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম, সে নির্লিপ্ত ও সুদূর থাকিয়া তার চেয়ে অধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সে বেশী কথা বলিত না বটে কিন্তু আমি লক্ষ্য করিতাম মাঝে মাঝে সে সংক্ষিপ্তভাবে যে দুই চারিটি কথা বলিত তাহা শ্রোতার প্রাণে যেন গভীর ভাবে মুদ্রিত হইয়া যাইত। তার অসাক্ষাতে তার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়া মানসী আমাকে সর্ব্বদা বিরক্ত করিয়া তুলিতেন। কোন দিন কোন কারণে সে আমার সঙ্গে না আসিতে পারিলে কেন আসিল না, কি হইয়াছে, কেমন আছে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার ললাট স্বেদার্দ্র হইয়া যাইত।

একদিন অপরাহ্ন বেলায় আমার অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছিল, সুতরাং সেদিন কোথাও বাহির না হইয়া সন্ধ্যার পরে বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলাম, এমন সময় বন্ধু আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—'আমি কাল চলে যাচ্ছি হে।'

আমি বলিলাম—'কেন?'

—'কেন আবার কি? আমার ইচ্ছা হয়েছে।'

বুঝিলাম মস্তিষ্কে একটা খেয়াল ঢুকিয়াছে সুতরাং এখন বিরত করিতে যাওয়া বৃথা। অপেক্ষাকৃত নম্র স্বরে বলিলাম—'যাবে যাও, কিন্তু শীঘ্র ফিরে আস্‌ছ ত?'—'এ অনুরোধ কি তুমি মন থেকে কর্চ্ছো?'

—'কেন, তোমার কি সন্দেহ হচ্ছে নাকি ?'

—'তা একটু হচ্ছে বটে। কারণ আমি না এলেই ত তোমার পথ নিষ্কণ্টক হয়।'

একে আমার মেজাজ ভাল ছিল না, তাছাড়া এরূপ অসূয়োক্তি শুনিয়া শুনিয়া আমার মন তিক্ত হইয়া গিয়াছিল। সেদিন আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। প্রবল বিবাদে বন্ধুত্বের অবসান হইল।

সেইরাত্রেই সে চলিয়া গেল। এবং অতীব দুঃখের বিষয় কয়েকদিন পরে জানিতে পারিলাম পথে ট্রেন চাপা পড়িয়া সে মারা গিয়াছে।

আমার পরিচিতেরা সে সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন।

[৩]

তখন হইতে এই অভিনব নাটকের একটি নবাঙ্কের উন্মোচন হইল। এবার শেষ পর্য্যন্ত আমিই ইহার একমাত্র নির্দ্বন্দ্বী নায়ক।

দিন অতীত হইতে লাগিল। আমি পূর্ব্ববৎ যাতায়াত করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে দুইদিন তারা আমার বাড়ী আসিলেন। একদিন নৌকা করিয়া সকলে মিলিয়া নদী উজান বাহিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে গেলাম। ভাবের ও

অনুভূতির আদান প্রদানও আগেরই মত চলিল। জীবনের এই সকল নবপ্রাপ্ত সুখের লহরে অবগাহন করিয়া বন্ধুস্মৃতি শীঘ্রই মন হইতে মুছিয়া গেল। কিন্তু যে আশা আমি এতদিন মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, একমাত্র ভয়ের কারণ দূর হইলেও তার সাফল্যের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যতবার আমি তার নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিতাম, ততবার তিনি সহসা অত্যন্ত বিমর্ষ, গম্ভীর, উদাস, অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেন ও বলিতেন—ভাবিয়া বলিব।

আমি তার এই ভাবান্তরের কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিতাম না। নানা সন্দেহে আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিত।

অবশেষে আমার পরীক্ষার ফল বাহির হইল। পিতা আমাকে অবিলম্বে বিলাত যাত্রার আয়োজন করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন।

যাইবার পূর্ব্বে শেষবারের মত আমার ভাগ্য পরীক্ষার্থে আমি বৃদ্ধের গৃহাভিমুখে চলিলাম।

তখন আসন্ন-সায়াহ্ন কাল। বৃদ্ধ বারান্দায় অলসভাবে পদচালনা করিতে করিতে গুণ্ গুণ্ স্বরে ব্রহ্মসঙ্গীতের একটি গানের দুইটি পদ গাহিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে নদীবক্ষ-প্রতিফলিত সায়াহ্ন-শোভার দিকে দৃক্পাত করিতেছিলেন।

আমি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তার মুগ্ধ ভাব নষ্ট করিয়া বলিলাম—'আমি কাল চলে যাব ভাবছি।'

সাশ্চর্য্য প্রশ্ন—'কালই কেন?'

—'বাবা ডেকেছেন, আগামী জাহাজে বিলাত যাবার উদ্যোগ করতে হবে।'

—'ও! বিলাত যাচ্ছ? সে বেশ ভাল কথা। সেখানে কিসে চেষ্টা কর্ব্বে? বারে,—না আই, সি, এস...'

—'তা আমি এখনো কিছু স্থির করিনি। তবে বোধ হয় বারেই যোগ দেব।'

তার নিকট হইতে বিদায় লইয়া মানসীর অন্বেষণে আমি বাগানে গেলাম। স্নিগ্ধবাতান্দোলিত বঞ্জুল-মঞ্জুলে বেঞ্চে উপবেশন করিয়া দিবাবসানের ম্লানায়মান আলোকে তিনি একটি পুস্তক পাঠে নিমগ্ন ছিলেন। পড়িতে পড়িতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে আমার আগমনধ্বনি তার কর্ণগোচর হয় নাই। আমি পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, তার শিথিল শিরোরুহ প্লাবিত স্কন্ধের উপর দিয়া উন্মুক্ত গ্রন্থপৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তার চেতনার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

একটা শুষ্কপত্র শাখাচ্যুত হইয়া পৃষ্ঠার উপর পড়িল। সেটা সরাইবার চেষ্টা করিতে গিয়া আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—

—'বাঃ, আপনি এখানে অমনভাবে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ ?'

—'অল্পক্ষণই, তবে পুথি-বিভোর দেখে বাধা দিতে ইচ্ছা হয় নি।'

—'বেশ্ ত···অন্য কোন কাজ ছিল না, তাই একটা বইয়ের সাহায্যে সময় কাটাচ্ছিলাম, বসুন।,

আমি উপবেশন করিয়া বলিলাম—'আমার সংবাদ আশা করি শুনেছেন ?'

—'হাঁ, বাবার মুখে শুনেছিলাম আপনি এম্-এ পাশ করেছেন। কিন্তু সুসংবাদটা আপনি নিজে দিতে না এসে চাকরকে দিয়ে নোট্ লিখে পাঠিয়েছিলেন কেন ?'

—'আমি সময় করে উঠ্তে পারি নি। এ সংবাদের সঙ্গে বাবার একখানা চিঠি এসেছিল তিনি আমাকে বিলাত যেতে ডেকে পাঠিয়েছেন। লিখেছেন একদিনও দেরী না করে চলে যেতে, সেজন্য জিনিষপত্র গুছাতেই দিন কেটে গেল।'

—'তবে কি আপনি আজই চলে যাচ্ছেন ?'

—'না, আজ না, কাল দুপুর বেলা যাব মনে করেছি।'

কিছুক্ষণ আমরা উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। তিনি অঙ্গুলদ্বারা বইয়ের মলাট খুঁটিতে লাগিলেন, আমি চকিত কটাক্ষে মাঝে মাঝে তার মুখভাব পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

অবশেষে মৌনতা ভগ্ন করিয়া বলিলাম—'আর বোধ হয় আমাদের দেখা শুনা হবে না......'

—'কে জানে, বোধ হয়।' কাতরস্বরে তার মুখ হইতে কথাগুলি বাহির হইল।

—'কিন্তু যেখানেই যখনই যাইনা, থাকি না কেন, আপনার স্মৃতি চিরদিন আমার মনে জাগরূক থাক্‌বে......'

সরমে তার কপোল রাঙা হইয়া উঠিল। আবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতা। তারপর বলিলাম—'শুধু বিদায়ের আগে শেষবারের মত যদি আপনার মনোভাব জেনে যেতে পারতাম্‌!'

আস্তে আস্তে, অস্পষ্ট স্বরে, উদাস দৃষ্টিতে পরপারের বন-নীলিমার চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—'আপনি কি আমাকে প্রাণমনে কামনা করেন?'

—'হাঁ, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি কায়মনোবাক্যে আপনাকে কামনা করি। জীবনে এই আমার প্রথম ভালবাসা, আমার যৌবনের সকল ঐকান্তিকতা নিয়ে আমি—'

—'কিন্তু আমাকে না পেলে কি আপনি অসুখী হবেন? এ বিপুল পৃথিবীতে কত নারী আছে; হয়ত কোনদিন কোথাও আমার চেয়ে ভাল একজনের সাক্ষাৎ পাবেন......'

—'কিন্তু আমি আর কাউকে চাই না; আমি শুধু আপনাকে চাই।'

পাষাণীর মন গলিল! অবশেষে তিনি স্বীকার করিলেন তিনি আমার হইবেন। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া রাত্রি অবতীর্ণ হইল—পরম সুন্দর, সুধাধবল, চন্দ্রমাশালিনী রাত্রি। আমরা সেইখানে বসিয়া রহিলাম। বাতাস তার চুলগুলিকে লইয়া খেলা করিতে লাগিল। বাগানের ইতস্ততঃ পত্রান্তরাল-পতিত দ্বিজরাজ-লেখা আমাদের চারিদিকের লঘু ছায়ারাজ্য মায়াময় সুষমায় ভূষিত করিয়া তুলিল। সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ, নির্জ্জন—শুধু অদূরে হিল্লোল-প্রফুল্ল তটিনীর উচ্ছল-বেলাঘাত-প্রসূত কলকাকলী—আর মাথার উপরে একটা অদৃশ্য পাপিয়ার চিত্তোদ্বেলকারী অনন্ত পিপাসাময় অশ্রান্ত আবেগ-কূজন।

সেদিন নূতন চক্ষে আমি রজনীর নূতনরূপ, জীবনের নূতনরূপ, পৃথিবীর নূতনরূপ অবলোকন করিলাম।

ধীরে অতি ধীরে আমার বাহু তার শীতল কণ্ঠ বেষ্টন করিল এবং আরো ধীরে আমার যৌবনব্যগ্র ওষ্ঠাধর তীর্থগামী যাত্রীর মত তার অধর প্রান্তের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল……

তিনি বলিলেন—'চলুন ভিতরে যাওয়া যাক্।'

আমরা উঠিলাম ও দুই এক পা অগ্রসর হইলাম। কিন্তু সহসা যেন তড়িৎ-ক্রীড়িত হইয়া, ত্বরিতে পশ্চাতে সরিয়া গিয়া, বাতাহত বেতসের মত থর থর করিয়া কাঁপিতে

কাঁপিতে, বিবর্ণ আননে, ভীত কম্পিত স্বরে তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'সে!'

এই নিরাপদ নিরালায় অকস্মাৎ তার এইরূপ ব্যবহারে আমি স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি হয়েছে? কে?'

—'সে!' অস্ফুটস্বরে কেবল মাত্র এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া হতচেতন ভাবে তিনি আমার বাহুবেষ্টনের মধ্যে পড়িয়া গেলেন। আমি তাকে টানিয়া নিয়া বেঞ্চের উপর শায়িত করিলাম এবং নদীতে ছুটিয়া গিয়া রুমাল খানা জলে ভিজাইয়া আনিয়া মস্তকে ও মুখে চক্ষে জল প্রক্ষেপ এবং বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বাতাস করিতে লাগিলাম।

শীঘ্রই তিনি সচেতন হইয়া উঠিলেন। যেন গভীর নিদ্রা হইতে জাগিয়া বিস্ময়ের সহিত চারিদিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'আমি কোথায়?'

—'বাগানে।'

ক্রমে সমস্ত স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। আর কিছু না বলিয়া আমার স্কন্ধে ভর দিয়া তিনি গৃহাভিমুখে চলিলেন।

[৪]

চিন্তিত, ব্যথিত চিত্তে সে রাত্রে আমি স্বীয় ভবনে ফিরিয়া আসিলাম। আমার পরিপূর্ণপ্রায় সুখচন্দ্রমা সহসা এ কোন বিধুন্তুদ কবলস্থ করিল? এই রহস্যময় অজ্ঞাত 'সে' ব্যক্তিটি

কে? এই কি তবে এতদিন ধরিয়া আমার সৌভাগ্য পথ বারিত করিয়া রাখিয়াছিল?—একি আমার মৃত বন্ধু? মূর্খ! যে মৃত সে আবার ফিরিবে কি করিয়া? তবে কি অন্য কেহ এই তরুণি-বক্ষ বিহার কবিতেছে? সারারাত্রি ধরিয়া ইত্যাদি এলোমেলো চিন্তা আমার মস্তিস্ক তোলপাড় করিতে লাগিল।

ভোরের দিকে তন্দ্রার ঘোরে একটি স্বপ্ন দেখিলাম। যেন আমি এক অপরিচিত নদীতট ধরিয়া চলিয়াছি। চলিতে চলিতে একটি বাঁধান ঘাটে উপনীত হইয়া দেখিলাম—মানসী বসিয়া।—আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"ভাল হ'ল, একা নাম্‌তে ভয় হচ্ছিল। চলুন দুজনে নামি।" আমরা নদীতে সাঁতার দিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরে একটি ক্ষুদ্র তরী ভাসিয়া আসিল, তবীর গলুই-এ একজন যুবক উপবিষ্ট। কাছে আসিয়া সে মানসীর হাত ধরিয়া বলিল—'নৌকায় উঠ।' আমি ক্ষিপ্ত হইয়া বলিলাম—'কে তুমি বর্ব্বরের মত একজন অপরিচিত মহিলার হাত ধরে টানাটানি করছ?' সে বলিল—'এ আমাকে কথা দিয়েছিল।' আমি বলিলাম—'ভাল চাও ত ছাড় বল্‌ছি।' সে বলিল—'ভাল চাও ত তুমি কথা না কয়ে চলে যাও।' এইরূপে কথা কাটাকাটির ফলে আমি অধীর ভাবে নৌকায় আরোহণ করিয়া তাকে প্রহার করিতে উদ্যত

হইবা মাত্র নিমেষে অজ্ঞাত যুবকের চেহারা আমার বন্ধুর চেহারায় রূপান্তরিত হইয়া গেল এবং আমি জাগিয়া উঠিলাম।

চাকর আসিয়া বলিল—'বাবু আজ যাবেন ত?'

আমি বলিলাম—'হাঁরে, যাব। তোর সন্দেহ হচ্ছে না কি?'

কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে আরেকবার তার সঙ্গে দেখা করিবার ও পূর্ব্বদিনের রহস্য সম্বন্ধে তথ্য অবগত হইবার জন্য সকালবেলা মুখহাত ধুইয়া আমি আবার নির্গত হইলাম।

প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র, তাদের ভৃত্যের সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল—'বাবু, আমি আপনার কাছে যাচ্ছিলাম।'

—'কেন?'

—'মাইজীর জ্বর হয়েছে। বাবু আপনাকে আসতে বল্লেন।'

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ করতলে মস্তক রাখিয়া একখানা চেয়ারে বিষণ্ণ ভাবে বসিয়া রহিয়াছেন। তার পার্শ্বে পালঙ্কে রোগিনীর মুখখানা দেখা যাইতেছে মাত্র—এক রাত্রির ভিতর তাহা অত্যন্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল।

বৃদ্ধ আমাকে দেখিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া কাতর বদনে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এসেছ বাবা?—কালরাত্রে তুমি যাবার পর হতে সে অসুস্থ বোধ করে। সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ও মাথাব্যথা হয়ে বারোটার পর জ্বর হয়, শেষ রাত্রের দিকে জ্বর অত্যন্ত প্রবল হয়। তখন দু চার বার জ্বরের ঘোরে

প্রলাপও বকেছিল—এখন এক রকম মুহ্যমান হয়ে পড়ে আছে—শুশ্রূষা করারও দ্বিতীয় লোক নেই·········এ সময় তুমি আমাদের ছেড়ে যেতে পার্‌বে না বাবা।'

ক্রমাগত আটদিন তিনি একরূপ জীবন-মরণের সন্ধিস্থলে রহিলেন। এই সময়ের ভিতর জ্বরের তাপ একদিনের জন্য কমে নাই, বিকারের লক্ষণও পূর্ণ মাত্রায় দেখা দিল। ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন হার্ট অত্যন্ত দুর্ব্বল, যে কোন মুহূর্ত্তে ইহার ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইতে পারে। অত্যন্ত সাবধানে নাড়াচাড়া ও সেবা শুশ্রূষা করিতে হইবে। তিনি অনুমান করিলেন কোনরকম ভয় পাইয়াই জ্বর হইয়া থাকিবে। আমি স্বগৃহ ছাড়িয়া দিন রাত সেইখানেই বাস করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে তার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

নবম দিন হইতে রোগের গতি ফিরিয়া ক্রমে ভালোর দিকে চলিল। এবং দুই সপ্তাহ পরে জ্বর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া গেল। ধীরে ধীরে শয্যাত্যাগ করিয়া কারো সাহায্যে কক্ষে পায়চারি করিবার সামর্থ্যও তার হইল।

এখন আর পূর্ব্বের মত সারাদিন সেখানে না থাকিলেও, প্রতিদিন সকাল বিকাল আমি সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। সে সময় আমি তার চিত্ত-বিনোদনের জন্য মাসিক পত্র, সংবাদ পত্র কিংবা অন্য কোন পুস্তক পাঠ করিয়া

শুনাইতাম। তিনি একখানা ইজি চেয়ারে অবশ ভাবে হেলান দিয়া শুইয়া আমার দিকে কৃতজ্ঞ চক্ষে চাহিয়া থাকিতেন আর বলিতেন—'আপনার সেবা না পেলে বোধ হয় এবার আর বাঁচতামই না।'

এইরূপে আরো কিছু দিন অতীত হইল। রোগিনী ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। পিতার পীড়াপীড়িতে যাত্রার দিন আমি আর অধিক কাল স্থগিত রাখিতে পারিলাম না।

যাইবার পূর্ব্বদিন বিকাল বেলা আমরা পুনরায় বাগানের সেই বেঞ্চে গিয়া বসিলাম। সেদিনও তটিনী হিল্লোলপ্রফুল্ল, বাতাস সুমন্দ মধুর, আকাশ সায়াহ্ন-শোভায় পরিপূর্ণ; পরপারের তরু-নীলিমার উপর দিয়া শীর্ণ শারদ মেঘমালা থরে থরে ভাসিয়া যাইতেছিল এবং পাপিয়ার পরিবর্ত্তে কোন্ সুদূর নীড় হইতে একটা ঘুঘু তার মর্ম্মস্পর্শী বেদনার ডাক ডাকিতেছিল।

আমরা সেখানে মিলিত করে নিস্তব্ধ নীরব হইয়া বসিয়া রহিলাম। আসন্ন বিচ্ছেদের বেদনা আমাদের হৃদয় অবসন্ন, অধর আড়ষ্ট করিয়া দিয়াছিল। আমরা পরস্পরকে কি বলিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, শুধু বাষ্পাকুল নেত্র আমাদের মনোভাব কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছিল।

অনেকক্ষণ কাটিলে মানসী ধীরে ধীরে বলিলেন—'গিয়ে প্রতি মেলে চিঠি দিও।'

আমি বলিলাম—'নিশ্চয়।'

আবার নিস্তব্ধতা। তখন বাগানে সেই দিনের ঘটনার কথা সহসা আমার মনে পড়িল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'একটা প্রশ্ন করি, সদুত্তর দেবে?'

—'কি প্রশ্ন শুনি।,

—'সেদিন বাগানে তোমার কি হয়েছিল, কাকে দেখে তুমি অমন করেছিলে?'

—'সে কথা এখনো মনে আছে? আমি ত ভুলেই গিয়েছিলাম।'

—'আমারও মনে ছিল না। এই মাত্র মনে পড়ল।'

—'আমি ঠিক বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে যা দেখেছিলাম তা সত্যি কি মিথ্যা।'

—'কিন্তু কাকে দেখেছিলে?'

—'আমি……আরেক সময় বল্‌ব।'

—'সে সময় আর হবেনা, এখনি বলা ভাল।'

—'আমি তাকে দেখেছিলাম।'

—'কাকে?'

—'সেই মৃত………'

এমন সময় ভৃত্য একখানা চিঠি হাতে করিয়া আনিয়া তাকে দিয়া বলিল—"বাবুজী এই চিঠি দিয়েছেন। এটা

নাকি আপনার অসুখের সময় এসেছিল। এতদিন দেবার মনে ছিল না, আজ হঠাৎ কতকগুলি বইয়ের নীচে এটা পাওয়া গেছে।"

সে চলিয়া গেল। তিনি চিঠি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। আমি তার দিকে চাহিয়া রহিলাম। কিন্তু পড়িতে পড়িতে সহসা তার আনন ফ্যাকাশে হইল, চক্ষের দীপ্তি নিভিয়া গেল, হাত কাঁপিতে লাগিল। মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আক্ষেপের স্বরে বলিয়া উঠিলেন—'ও!'

তারপর চিঠিটা আমার ক্রোড়ে নিক্ষেপ করিয়া দ্রুতবেগে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেলেন। আমি কিছু বুঝিতে না পারিয়া কিছুক্ষণ বিস্মিত, বিমূঢ় ভাবে তার বিলীয়মান চেহারার দিকে চাহিয়া রহিলাম। অবশেষে চিঠিটার দিকে আমার নজর গেল। দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম আমার বন্ধুর হস্তাক্ষর। তাতে লেখা ছিল :—

"......এই চিঠি পাইয়া তুমি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে, কারণ তোমরা বোধ হয় শুনিয়াছ আমি মারা গিয়াছি। কিন্তু এতদিন আমি মরি নাই, আজ আমার যথার্থ মৃত্যু হইল। এতকাল আমার মৃত্যু সম্বন্ধে যা শুনিয়াছ তা সম্পূর্ণ রটনা মাত্র। কিরূপে রটিল বলিতেছি।

"যে দিন তোমার সঙ্গে শেষ সায়াহ্ন যাপন করি সেদিন বিদায়ের সময় তোমাকে বলিয়াছিলাম, পরদিন আমি

আমি চলিয়া যাইব। তুমিও তাতে মত দিয়া বলিয়াছিলে কলিকাতায় আমাদের পুনর্ম্মিলন হইবে। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ সেইরাত্রেই আমাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হয় এবং সেখানে দুইদিন অবস্থান করিয়া তারপর বাড়ীর দিকে রওয়ানা হই। কিন্তু যাইতে যাইতে কি খেয়াল চাপিল, পথিমধ্যে ট্রেন পরিবর্ত্তন করিয়া, বাড়ী না গিয়া উড়িষ্যায় আমার একবন্ধুর নিকটে চলিয়া যাই!

"সেখানে সকলের নিকট হইতে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ভাবে জীবন যাপন করিতে সুরু করি। কাহাকেও, এমন কি আমার পিতামাতাকেও আমার অবস্থিতি-সংবাদ জানাই নাই।

"পরীক্ষার ফল বাহির হইলে, কলিকাতায় আসিয়া শুনি আমার নামে জনরব রটিয়াছে, আমি নাকি ট্রেন চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছি। কিরূপে ইহা রটিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যে ট্রেনে আমি বাড়ী যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে তাহা পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত কাল পরেই, অপর একটী ট্রেনের সঙ্গে ইহার সংঘর্ষ হইয়া বহুলোক হত হয়। ইতিমধ্যে আমারও আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই, সুতরাং লোকে মনে করে, হত ব্যক্তিদের ভিতর আমিও একজন।

"শুনিয়া মনে হইল হয়ত তোমরাও এসংবাদ শুনিয়া থাকিবে। তাই অবিলম্বে তোমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য চলিয়া

আসি। সন্ধ্যার একটু পরে আমি পৌঁছি এবং প্রথমে বন্ধুর গৃহে যাই, কিন্তু সেখানে তাকে না পাইয়া তোমাদের বাড়ীর দিকে চলিতে থাকি।

"তারপর বাগানে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম তাহা —ওঃ!—তাতে আমার বুক বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অথচ একদিন এই বুক ছুঁইয়া তুমি শপথ করিয়া বলিয়াছিলে—তুমি আমাকে ভিন্ন আর কাকেও ভালবাস নাই, কোনদিন বাসিবেও না......"

চিঠিটার আরো একটি পৃষ্ঠা ছিল কিন্তু নিক্ষেপ করিবার কালে সেটি দূরে সরিয়া পড়ে এবং বাতাসে অন্যত্র লইয়া যায়। সুতরাং তাতে কি লেখা ছিল তা জানিতে পারি নাই।

চিঠি পড়িয়া আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পালঙ্কের উপর বিছানায় মাথা গুঁজিয়া তিনি ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছেন।

আমি তাকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। কোন উত্তর হইল না। আবার ডাকিলাম। তথাপি উত্তর হইল না। তৃতীয় বার ডাকিলাম। তখন তিনি ক্ষিপ্রবেগে উঠিয়া আলুথালু কেশে, সজল নেত্রে, বিরক্তি-রক্তিম মুখে বলিলেন—

"নিষ্ঠুর, আপনি আমার সর্ব্বনাশ করেছেন! আপনি যান, আপনি যান!" বলিয়া তিনি অপর একটি কক্ষে নির্গত হইয়া গেলেন।

আমি নিমেষকাল হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমার চক্ষুর সম্মুখে যেন অন্ধকার হইয়া আসিল। মাতালের মত টলিতে টলিতে সিড়ি দিয়া অবতরণ করিয়া আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

পরের সপ্তাহে আমি বিলাত যাত্রা করি। ইহার পর সেই মহিলার ও সেই বন্ধুর আর কোন খোঁজ রাখিয়াই।

ডাক্তার

'বলুন না আপনি বিয়ে কর্ব্বেন না কেন ?' আমরা আবার ডাক্তার মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ডাক্তার একটা চেয়ারে বসিয়া চুরুট টানিতেছিলেন। চুরুটের ধোঁয়া তার বাঙ্গালী স্থলভ মোলায়েম মুখমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে নানারূপ সর্পিল আকারে ঘুরিতে ফিরিতেছিল। আমাদের প্রশ্ন শুনিয়া, একটু ফুঁ দিয়া মুখের সম্মুখ হইতে ধোঁয়াটা সরাইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া তিনি একটু হাসিলেন। এ হাসি আমাদের পরিচিত বিষণ্ণ করুণ হাসি। আমরা সতত মনে করিতাম, এই হাসির পশ্চাতে একটা বেদনার কাহিনী লুকান রহিয়াছে। কিন্তু কি, তাহা অনুমানও করিতে পারিতাম না।

ডাক্তার অন্যদিকে চাহিয়া যেন একটু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—'কেন বিয়ে করি না যদি জানতে চাও, তা'হলে তোমাদের আমার জীবনের একটা ইতিহাস বলতে হয়। আচ্ছা শুন, বলি।'

"১৮৯৬ সালের কথা। আমি সে সময় তোমাদের মত একটী সংসারঅনভিজ্ঞ কচি বয়সের যুবক, কলেজে পড়ি। তখন আমার একজন সতীর্থের সঙ্গে আমার প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। তিনি একজন বড়লোকের সন্তান ছিলেন। তখনকার দিনে ছোট বড়তে বন্ধুত্ব এখনকার চেয়ে অনেক বেশী হইত।

একদিন আমার এই বন্ধুটী আমাকে বলিলেন—'শুনছ সতীশ, চল এবারকার ছুটিটা দুজনে মিলে আমাদের বাড়ীতে কাটিয়ে আসি। সারা ছুটী কাটাতে না চাও, প্রথম কিছুদিন কাটিয়ে পরে না হয় তুমি চলে এসো। প্রত্যেকটা ছুটী আমাকে

সেখানে একা কাটাতে হয়, এবার তুমি গেলে একজন সঙ্গী পাই। সেখানে তোমার কোন অসুবিধা হবে না। আমার বাবা মার কাছে আমি অনেক সময় তোমার কথা বলেছি, তাঁরা তোমাকে দেখে সুখী হবেন। আশা করি তোমার সময় সেখানে মন্দ কাটবে না, বিশেষতঃ তোমার যখন শিকারে হাত আছে, সেখানে পাখী শিকারের খুব সুবিধা।

আমি সম্মতি দিলাম।

কয়েকদিন পরে অপরাহ্ন বেলায় আমরা একটী ক্ষুদ্র ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। বন্ধু নামিয়াই ইতস্ততঃ তাকাইতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—'কি হো'ল ?'

—'টম্‌টম্‌টা আসার কথা ছিল, আসেনি দেখছি।'

—'তাতে কি! কতটুকু পথই বা, চল হেঁটেই মেরে দেওয়া যাক।'

কিন্তু আমরা আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া তারপর হাঁটিতে সুরু করিলাম। কিছুদূর না যাইতেই চাকার ঘর্ঘর এবং ঘুঙুরের শব্দ শুনা গেল। পরমুহূর্ত্তেই তেজী লাল ঘোড়ায় টানা একটা কালো টম্‌টম্‌ আসিয়া আমাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। বন্ধু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই একজন উর্দ্দিপরা মধ্যবয়সী সহিস্‌ লাফাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া, সেলাম করিয়া বলিল—'হুজুর, নয়া ঘোড়া, বড় মগরা...তাইতে দেরী হয়েছে...'

নি রা লা য়

আমরা গাড়ীতে চাপিয়া বসিলাম। বন্ধু লাগাম হস্তে চাবুক ঘুরাইতেই চক্ষের পলকে শেষ সূর্য্যের স্বর্ণ-বিভারঞ্জিত সড়কের নরম ঘাসের উপর দিয়া চাকা দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। আমরা দুই পার্শ্বে শস্যোদ্গত অখণ্ড-শ্যাম বিস্তীর্ণ ক্ষেত্ররাজি অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমাদের চক্ষের সম্মুখে দূর-দিগন্ত-বিলীন, গ্রাম-গোপন-কারী বনের স্নিগ্ধ তামস-রেখা এবং তদূর্দ্ধে মেঘ সঞ্চারিত আকাশে নিদাঘের মনোরম দিনান্ত-শ্রী শোভা পাইতে লাগিল।

প্রায় আধঘণ্টা চলিবার পর একটা প্রকাণ্ড ফটকের ভিতর শ্যামল কোমল একটী প্রশস্ত প্রাঙ্গণে গাড়ী থামিল। এণ্ডি চাদরে শরীর জড়াইয়া একজন শুভ্র-শীর্ষ বৃদ্ধ সেখানে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। গাড়ী থামিতেই তিনি নিকটে আসিয়া বলিলেন—'এসেছ বাবারা? এস, এস...'

বুঝিলাম ইনি বন্ধুর পিতা। নামিয়া প্রণাম করিলাম। তখন তিনি আমাদের শারীরিক কুশল এবং অন্যান্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে করিতে গৃহের দিকে লইয়া চলিলেন।

তখনো কিছু বেলা ছিল। আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া বাড়ীটার চারিদিক দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলাম।

বাড়ীটা প্রাচীন হইলেও বিশেষ মজবুত ছিল। তাতে কয়েক সারি বড় বড় প্রাচীন গাছ ছিল। তাদের উচ্চ

ডালগুলি আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়া গিয়াছে; সন্ধ্যাবেলার বাতাস সেগুলির ভিতর দিয়া ক্লান্ত মানুষের কাতর দীর্ঘনিঃশ্বাসের মত বহিয়া আসিতেছিল।

সন্ধ্যার পরে আমি পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলাম।

বৃদ্ধ বারান্দায় বসিয়া প্রজাদিগের সঙ্গে বিষয় সংক্রান্ত আলাপ করিতেছিলেন। আমি আসিবামাত্র তাদের বিদায় দিয়া তিনি আমার সঙ্গে আলাপ সুরু করিলেন। তিনি আমাকে তাঁর পারিবারিক ইতিহাস বলিতে লাগিলেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষরা পূর্ব্বে অত্যন্ত গরীব ছিলেন, পরে প্রভূত সম্পদের অধিকারী লইয়া পুনরায় দীনাবস্থায় পতিত হন। তাঁর পিতার আমল হইতে তাঁদের অবস্থা আবার বেশ স্বচ্ছল হইয়া উঠে ইত্যাদি।

তার পরে আমরা আহার করিতে গেলাম।

দিন পনেরো আমি সেখানে ছিলাম। পরিবারের সকলের সঙ্গেই বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। আসিবার পূর্ব্বদিন রাত্রে একটা ঘটনা ঘটিল। রাত্রে আহারের পর আমি ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বিছানার উপর এক টুকরা কাগজ পড়িয়া রহিয়াছে। আমি পড়িলাম। তাতে লেখা ছিল—'অনুগ্রহ করিয়া আজ রাত্রে সকলে না ঘুমাইলে দরজা বন্ধ করিবেন না।'

নিম্নে কোনরূপ নাম স্বাক্ষর ছিল না। কে লিখিয়াছে

ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে কৌতুহলের উদ্রেক হইল, দরজা খোলা রাখিয়া, আলোটা কমাইয়া আমি জানালার কাছে গিয়া বসিলাম। বাহিরে আকাশে মেঘ করিয়াছিল এবং বাগানের গাছগুলির ভিতর দিয়া সন্‌সন্‌ রবে বাতাস বহিতেছিল। কয়েক মিনিট পরে দূরে একটা প্রচ্ছন্ন কলরব শুনা গেল এবং নিমিষের ভিতর নিকটবর্ত্তী ভূমির উপর দিয়া কলকল শব্দে জলস্রোত বহিয়া যাইতে লাগিল।

তারপর আবার আকাশ পরিষ্কার হইয়া নির্ম্মলদীপ্তি তারা ফুটিয়া উঠিল। এমন সময় আমি অনুভব করিলাম কে যেন দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি উৎসুক ভাবে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম।...একজন যুবতী রমণীর চেহারা দরজার ফাঁক দিয়া ভাসিয়া উঠিল।...চৌকাট অতিক্রম করিয়া সে একেবারে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল. আমি দেখিলাম এ আমার বন্ধুর অপরিণীতা কনিষ্ঠা ভগিনী সুরমা।

আমি কৌতুহল পরবশ হইয়া আর যারই আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকি না কেন, সুরমাকে সেখানে দেখিব তাহা স্বপ্নেও আশা করি নাই। সুতরাং তাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম—'একি সুরমা?'

—হাঁ, আমি ভেবেছিলাম দরজা খোলা পাব না...'

—'তুমিই লিখে পাঠিয়েছিলে?'

—'হাঁ, সেজন্যে আশা করি কিছু মনে করেন নি, যদিও বিষয়টা মনে করারই মত...এতটা সাহস করেছি শুধু...'

বলিতে বলিতে সে থামিয়া কথাটা ঘুরাইয়া বলিল 'আপনি কাল চলে যাচ্ছেন ?'

'হাঁ ..'

—'কোথায় যাবেন ?'

—'প্রথমে বাড়ী যাব। সেখানে এক সপ্তাহ থেকে, কয়েকজন আত্মীয়ের বাড়ী হয়ে, দিন পনেরো পরে কলকাতায় পৌঁছাব।'

—'আর বোধ হয় শীগ্‌গির এদিকে আসবেন না...'

—'বোধ হয় না—কেন ?'

—'অমনি জিজ্ঞাসা কচ্ছিলাম।'

আমি তার মুখে একটা পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। প্রথম হইতেই মুখ বিষণ্ণ ছিল, কিন্তু তাহা আরো বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। তার ঠোঁট দুইটী কাঁপিতে লাগিল, শরীরের বর্ণ পাংশু হইয়া গেল, সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি হে'াল ?'

— না, কিছু না, আপনার জিনিষ পত্র গুছান হয়ে গেছে ? ...আমি গুছিয়ে দিচ্ছি।'

—'না, না, সে আমি গুছিয়ে নিতে পার্ব্ব, কিন্তু...'

—'চাবিটা দিন না,...এই যে পেয়েছি...'

সে চাবি লইয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া আমার জিনিষ পত্র গোছ করিয়া রাখিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।... সহসা আমার চেতনা হইল। নিশীথে অমনভাবে একজন যুবক পরপুরুষের সহিত একজন যুবতীর সাক্ষাত কিরূপ দোষনীয় ব্যাপার, আমি সহসা তাহা অনুধাবন করিলাম। এতক্ষণ এটা যে বুঝিতে পারি নাই সেজন্য নিজের উপর এবং তার উপর আমার ক্রোধসঞ্চার হইল। আমি দৃঢ়স্বরে বলিলাম—'দেখ, তুমি যে এই চিঠিটা লিখেছ তা আমি অনুমান করতে না পেরে কৌতূহলের বশে আমি দরজা খোলা রেখেছিলাম। কিন্তু তুমি এ লিখেছ দেখে আমি বড়ই আশ্চর্য্য ও মর্ম্মাহত হয়েছি! তুমি একজন ভদ্রকন্যা আর আমি একজন অনাত্মীয় যুবক, তোমার ভাইএর একজন বন্ধু মাত্র। এরূপ অবস্থায় আমার সঙ্গে এমনভাবে গোপনে সাক্ষাৎ করতে আসা কতদূর গর্হিত ও অবিবেচনার কাজ হয়েছে তা বোধ হয় তুমি বুঝতে পারনি। এর ফলে যে কি হতে পারে সে ধারণাও তোমার নেই...আমারও অন্যায় হয়েছে তোমাকে এতক্ষণ থাকতে দিয়ে...যাক্ যা হবার হয়েছে, তোমাকে আর জিনিষ পত্র গুছাতে হবে না, তুমি চলে যাও...'

সে মাথা নত করিয়া উত্তর না দিয়া বসিয়া রহিল। আমি

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া পুনরায় বলিলাম—

'যাও বলছি...দেরী করো না···।'

আমার কথাগুলি শেষ হইবার পূর্ব্বেই সে সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সজলনেত্রে, কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিল—'আমার এখানে আসা কি এতই অন্যায় হয়েছে? কি জন্য এসেছি তা কি আপনি জানেন না? একটুও না···একটুও না···সে কথা কি আমাকে মুখ ফুটে বলতে হবে? আমার হৃদয় সম্বন্ধে কি আপনি এতই অনভিজ্ঞ? আমি ভেবেছিলাম আপনিও'··· সহসা সে কাঁদিয়া ফেলিল।

আমি বলিলাম—'সুরমা, তুমি এসব কি বলছ···তুমি বোধ হয়···' তার মুখে এক প্রকার ক্রুদ্ধ, উদ্ধত ভাব ফুটিয়া উঠিল। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর···' বলিয়া সে ঘর হইতে চলিয়া গেল। আমি হতভম্ব হইয়া গিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিলাম। সে রাত্রে আমি আর ঘুমাইতে পারিলাম না। পরদিন প্রাতে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। বন্ধু এবং তার পিতা বিদায়ের সময় আমার হাত ধরিয়া, কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে পুনরায় তাদের বাড়ী হইয়া যাইবার জন্য বার বার অনুরোধ করিলেন। আমি মুখে 'হাঁ, বলিলাম কিন্তু মনে মনে স্থির করিলাম এখানে ফিরিয়া আসা আমার পক্ষে অসম্ভব···

নিরালায়

এক বৎসর পরে সুরমার বিবাহ হইল। আমি নিমন্ত্রণ পাইয়াছিলাম, কিন্তু যাই নাই।

কয়েক বৎসর পরের কথা। আমি ডাক্তারি পাশ করিয়া তখন এই সহরে ব্যবসা সুরু করিয়াছি।

একদিন শীতের রাতে, আহারের পর নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দ্বারে করাঘাত হইল। আমি ভাবিলাম কি জ্বালাতন, এত শীতে এ সময়ে কি করিয়া রোগী দেখিতে যাই। যিনি আসিয়াছিলেন তাকে বলিলাম—'মশায়, অনুগ্রহ করে অন্য ডাক্তার খুঁজে নিন্।,

তিনি কাতরস্বরে বলিলেন—'অন্য কেউ রাজী হয়নি, তাই আপনার কাছে এসেছি। একটু দয়া করুন ইত্যাদি।'

কাকুতি মিনতিতে মনটা নরম হইল। আঁধার রাতে ক্ষীণালোকে অস্থিভেদকারী শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রায় আধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া একটা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। সিঁড়ির কাছে একজন সুশ্রী চেহারার ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া দোতালার একটা কক্ষে উপনীত হইলেন। সেখানে একজন রোগিনী ছিলেন।

ভদ্রলোক রোগিনীর অবস্থা সমস্ত বিবৃত করিয়া অবশেষে অনুরোধের স্বরে বলিলেন—'আপনাকে অনুগ্রহ করে আজ সারারাত এখানে থাকতে হবে। রোগিনীর যে অবস্থা তাতে

আমরা একজন ডাক্তার ছাড়া থাকতে সাহস পাইনে!'

পার্শ্বের ঘরে আমার থাকিবার বন্দোবস্ত হইল।

অনেক রাত্রে আমি একবার রোগিনীকে দেখিবার জন্য পা টিপিয়া তার কক্ষে প্রবেশ করিয়া, শয্যার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। রোগিনী নিদ্রিত ছিলেন কিন্তু আমার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই জাগরিত হইয়া আমার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কে?'—'ভয় নেই···আমি ডাক্তার।'—'কোন ডাক্তার?'—'আমি আজ রাত্রে এসেছি···এখন কেমন আছেন?' —'আজ রাত্রে এসেছেন?'—'হাঁ, এখন কেমন আছেন?' তিনি আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—'এখন কেমন আছেন?' তিনি কোন উত্তর না দিয়া পূর্ব্বের মতই আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমি বলিলাম—'আমার দিকে চেয়ে অমন ভাবে কি দেখছেন?'

—'সতীশবাবু·না?'

আমি বিস্মিত এবং চমকিত হইয়া উঠিলাম। সাত বৎসর পূর্ব্বের এক রাত্রের ঘটনার স্মৃতি বিদ্যুতের মত আমার হৃদয়ের উপর খেলিয়া গেল। সেদিন অমানিশীথে যে বিকশিততনু কিশোরী আমার উন্মুখ যৌবনদেবতার সম্মুখে তার তরুণ অন্তরের অনবদ্য প্রেম অবদান বহন করিয়া আনিয়া ব্যর্থ মানসে ফিরিয়া গিয়াছিল, এ কি সেই? এ কি সেই সুরমা? তার

চেহারার এত পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে আমি তাকে চিনিতে পারি নাই। সে আমার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া বলিল—'চিন্‌তে পাচ্ছেন না?'

আমি বলিলাম—হাঁ, পাচ্ছি···তুমি সুরমা।'

—'তাকে এখনো আপনার মনে আছে?'

আমি অপ্রিয় বিষয়টা পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বলিলাম—'এখন তোমার বেশী কথা বলা ভাল নয়; তুমি এখন বড় দুর্ব্বল···।

—'ঘরে এখন আর কে আছে?'

—'আর কেউ নেই, শুধু আমি...

—'আমার স্বামী কোথায়?'

—'তিনি ওপাশের ঘরে আছেন।'

—'হুঁ:—'

সে যেন কি চিন্তা করিতে লাগিল, তারপর বলিল—'আবার যে এভাবে আপনার দেখা পাব তা ভাবিনি···দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন···'

আবার সেই কথা! কিন্তু আমি বসিলাম। সে আমার হাতখানা ধরিয়া তার বিভাহীন ললাটে স্থাপন করিল।··· 'আ! কি ঠাণ্ডা!'

আমি বুঝিতে পারিলাম আমার সান্নিধ্য তার মনে

উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছে। বিধাতা আমাকে এ কি বিপাকে ফেলিলেন! আমি উঠিয়া যাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু একবার পরিচয়ের পরে আমার অনুপস্থিতি তার স্নায়ুসমূহকে অধিকতর পীড়িত করিবে এই চিন্তা করিয়া আবার বসিয়া পড়িলাম।

সে বলিল—'সতীশবাবু, কেন আপনারা আমাকে বৃথা বাঁচাতে চেষ্টা কর্চ্ছেন? ··আমি বাঁচতে পারি না ··বাঁচতে চাই না···'

—'কে বল্লে তুমি বাঁচতে পার না···আমরা তোমাকে বাঁচাব।'

—'না, পারি না, আর কেন পারি না জানেন? তার কারণ আপনি·· একটা উপকথা বলি, শুনুন। এক সময় একস্থানে একজন নিরীহ বালিকা ছিল। একটা চিন্তাভাবনাহীন সুখ-মগ্ন প্রজাপতির মত সে তার পিতামাতার স্নেহকাননে উড়ে বেড়াত। একদিন এক সুন্দর রাজকুমার সেই কাননে বেড়াতে এল, তাকে দেখে বালিকার বড় ভাল লাগল। সে দুরাশার বশবর্ত্তী হয়ে তার নিকটে প্রেম-নিবেদন করতে গিয়েছিলে— কিন্তু চকোরের কেন খদ্যোতের আলোকে তৃষ্ণা মিটবে?—

সে নিরাশায় ফিরে এল। রাজপুত্র বিদায় নিলে, পিতা-মাতার স্নেহকাননও পূর্ব্বেরই মত বিকশিত হতে লাগল, কিন্তু সে আর পুনরায় সুখী হতে পারলে না।'

তারপর সহসা যেন স্বপ্নের ঘোরে প্রলাপের মত বকিতে লাগিল—'আমি কত চেষ্টা করেছি ভুলতে…পারিনি…সেই নিষ্ঠুরের ছবি…দিনরাত…আমার মনে…জেগেছে…স্বামীকে… প্রতারণা করে…আমি তার ধ্যান করেছি…কি কুক্ষণে…আমি… তাকে…দেখেছি · না…ম….'

প্রবল উত্তেজনায় তার মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইতে লাগিল। শরীর দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর, আনন নীলাভ, শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়া বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিল। অবশেষে অন্তিম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল।

স্বামী পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমি তাকে বলিলাম 'সব শেষ হয়েছে।'

তিনি আমাকে বিদায় দিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম— 'আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব।

দুই ঘণ্টা পরে আগুনের শিখা লকলক করিয়া উপরের দিকে উঠিল। আমি একটু দূরে একটা গাছের তলে দাঁড়াইয়া মোহাচ্ছন্নভাবে একদৃষ্টে সেইদিকে চাহিয়া রহিলাম। কতক্ষণ আমি সেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম বলিতে পারি না। একজন আমাকে ধাক্কা দিয়া বলিলেন—'ডাক্তারবাবু, চলুন, এখানের কাজ শেষ হয়েছে।'

সেইদিন হইতে আহারে বিহারে, নিদ্রায় জাগরণে সুরমার

চেহারা সহসা আমার চক্ষের সম্মুখে ভৌতিক প্রতিমার মত ভাসিয়া উঠে, আর তার মৃত্যুশয্যার কথাগুলি উদাস ঝঙ্কারে আমার কাণে বাজিতে থাকে—'আমি মরতে যাচ্ছি তার কারণ আপনি...'। আমার কেবলি মনে হয় যেন অকারণে আমি একটা হত্যা করিয়াছি। তার মৃত্যুটাকে আমি অন্য কোনরূপে কল্পনা করিতে পারি না। কতদিন রাত্রে নিদ্রার ঘোরে ভীষণ হত্যার স্বপ্ন দেখিয়া আমি চীৎকার করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছি। এমন সময় গিয়াছে যখন রাত্রে এই সব স্বপ্ন দেখিবার ভয়ে আমি ঘুমাইতে সাহস পাইতাম না। মনের এমন অবস্থা কি ভীষণ তাহা তোমরা জান না, তার অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমি কয়েকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সফলকাম হইতে পারি নাই। অবশেষে স্থির করিলাম বাঁচিয়া থাকিতে যে প্রেমের প্রতিদান পায় নাই, মরণের পরে আজীবন তার স্মৃতির তর্পণ করিয়া আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব...দেখি, তাতে যদি শান্তি পাই...!"

হাওয়া বদল

[১]

কয়েক বৎসর আগেকার কথা। একটী আত্মীয়কে লইয়া পশ্চিমের একটী স্বাস্থ্যকর সহরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। তিনি বহুমূত্র রোগে ভুগিতেছিলেন। ডাক্তার বলিলেন কিছুদিন পার্ব্বত্য স্থানে বাস করিতে হইবে। কিন্তু তার কোন নিকটাত্মীয় না থাকায় আমাকে সঙ্গী হইবার জন্য ধরিয়া বসিলেন। আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী বসিয়া সুদীর্ঘ অবসর উপভোগ করিতেছিলাম, এমন সময় তার এই অনুরোধ আমার কাছে একটী আনন্দ সংবাদের মত আসিল। বলা বাহুল্য আমি তৎক্ষণাৎ রাজী হইলাম।

[২]

সহরের প্রান্তে, জন-কোলাহল হইতে দূরে, কর্ক গাছের ছায়া-ঢাকা একটী পুরাতন বাড়ীতে আমরা বাসা নিলাম। বাড়ীটী বড় সুন্দর জায়গায় তৈরী করা হইয়াছিল। টিলার উপরে না হইলেও অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত ছিল বলিয়া, বাড়ীর প্রাঙ্গণ হইতে চারিদিকের দৃশ্য অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইত। দিকে দিকে নীল পাহাড়ের মেখলা, ঊর্দ্ধে অনন্ত নিষ্কলঙ্ক আকাশ, সম্মুখে অদূরে একটী স্ফটিকস্বচ্ছ ঝিল, ছোট ছোট শালের বন, সেই বনের ভিতর দিয়া শীর্ণকায় নির্ঝরিণী দিবারাত্র কুলুকুলু নাদে প্রবাহিত,—এমন প্রকৃতির

মধ্যে আমাদের এই নির্জ্জন গৃহ,—মনে হইত যেন আমরা দুইটী প্রাণী স্বপ্ন রাজ্যের কোন কুটীরে বাস করিতেছি।

রোগে ভুগিয়া আমার আত্মীয়ের মেজাজ খিট্‌খিটে হইয়া গিয়াছিল। কাজেই এমন সৌন্দর্য্য তার মনে কি ঝঙ্কার তুলিত বলিতে পারি না, কিন্তু আমাকে তা একেবারে মাতাল করিয়া দিয়াছিল। কাজের তাড়া আমার কিছুই ছিল না। জানালার ধারে বসিয়া, কাল-বোধ-রহিত হইয়া, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমি এই বিপুল, বিজন, মহৎ প্রকৃতির দিকে চাহিয়া থাকিতাম। ঝরণার কলধ্বনি, পার্ব্বত্য বায়ুর স্পর্শ, বনের মর্ম্মর, নীলাদ্রির সুগম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি, পাখীর গান, মেঘের খেলা, পাতার নৃত্য,—সমস্ত মিলিয়া আমার বিস্মিত অন্তরে বর্ণগন্ধগানের এক অভিনব কল্পলোক রচনা করিত। সকালবেলা গিরি উপত্যকা সোনার আলোকে অনুরঞ্জিত করিয়া যখন বনান্তরাল হইতে সূর্য্যোদয় হইত তখন তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য আমি অতি ভোরে শয্যা ছাড়িয়া পাহাড়ে ছুটিয়া যাইতাম। চন্দ্রমাশালিনী রাত্রে অকলঙ্ক জ্যোৎস্নায় নিস্তরঙ্গ হ্রদজলরাশি যখন তীরবর্ত্তী গাছগুলির প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিয়া আকাশের তলে পাহাড়ের ফ্রেমে আঁটা একখানি প্রশান্ত মুকুরের মতন পড়িয়া থাকিত, তখন আমি ইহার শাদ্বল-শ্যাম-সৈকতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত একাকী পায়চারি করিয়া বেড়াইতাম। কোন কোন দিন আমি সকালবেলা বাড়ী

হইতে বাহির হইয়া যাইতাম ও সারাদিন নদীর গতি অনুসরণ করিয়া বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসিতাম।

[৩]

একদিন সন্ধ্যার ম্লান আলোকে শালবন হইতে বাহির হইয়া একটী ছোট পাহাড়ের পাশ দিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। সম্মুখে দূরে আলো-আঁধারের মিলন রেখার কাছে গিরিশ্রেণী পতনোন্মুখ নিশার কোমল ছায়ায় একাকার হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পিছনে গতিহীন মেঘপুঞ্জের কাঞ্চন-কান্তি তখনো সম্পূর্ণ লোপ পায় নাই। আমি ক্লান্ত পদে, নিশ্চিন্ত মনে চলিতেছিলাম। এমন সময় সহসা শালবনের মর্ম্মরের সঙ্গে নারী কণ্ঠের আর্ত্তধ্বনি আমার কাণে প্রবেশ করিল। আমি চমকিত হইয়া দাঁড়াইলাম। চারিদিকে চাহিলাম কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে যেদিক হইতে শব্দ আসিয়াছিল, সেইদিকে ছুটিলাম। কিছুদূর যাইবামাত্র আমি এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখিলাম। দেখিলাম একজন কুড়ি বৎসর বয়স্কা শুভ্রবসনা বাঙ্গালী মেয়ে একটী দশ বার বৎসরের সুকুমার কান্তি দুর্ব্বল বালকের হাত ধরিয়া বারবার পিছনে চাহিতে চাহিতে রুদ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিতেছে আর অল্প দূরে তিনজন হিন্দুস্থানী যুবক তার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে। মহিলাকে নির্জ্জনে নিরাশ্রয়ে পাইয়া দুর্ব্বৃত্তগণ যে তার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে

তাহা বুঝিতে তিলমাত্র বিলম্ব ঘটিল না। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি কাতরকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আপনি ভদ্রলোক, আমাকে ওদের হাত থেকে রক্ষা করুন।"

আমি বলিলাম—"আপনার ভয় নেই, আপনি স্থির হয়ে দাঁড়ান, আমি দেখি।"

যুবক তিনজন আমাকে দেখিতে পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। আমি তাদের দিকে অগ্রসর হইয়া কেন তারা এই স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হইয়াছে প্রশ্ন করিলাম। তারা কিছুমাত্র ভয় পাইল না, বরং আমার সম্মুখেই হাস্য পরিহাসের সহিত নানাবিধ অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল! আমার শরীর জ্বলিয়া উঠিল, সহসা একজনের গালে আমি একটা প্রকাণ্ড চপেটাঘাত করিয়া বসিলাম। তিনজন একসঙ্গে আমাকে আক্রমণ করিল। দুই দিক হইতে কিছুক্ষণ সমানভাবে ঘুষি বিনিময় চলিল। আমি যুযুৎসু জানিতাম, চতুরতার সহিত নিজেকে রক্ষা করিয়া আক্রমণ ব্যর্থ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সুযোগ পাইয়া তাদের এক-জনের কাণের কাছে এমন প্রবলভাবে আঘাত করিলাম যে লোকটা দৃষ্টি উর্দ্ধে তুলিয়া বাতাসে স্খলিত পাতার মত দুই তিন বার পাক খাইয়া ধপাস্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। এক-জনকে এরূপভাবে ধরাশায়িত হইতে দেখিয়া অপর দুইজনের

মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। 'ইয়ার'টীকে সেখানে ত্যাগ করিয়াই তারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল।

[৪]

যতক্ষণ এই বাহু যুদ্ধ চলিতেছিল মহিলাটী শঙ্কাকুলচিত্তে ভীত নেত্রে তাহা দেখিতেছিলেন। দুর্ব্বৃত্তদিগকে বিতাড়িত করিয়া নিকটে আসিবামাত্র তিনি বলিলেন—

—"আপনাকে যে কি ভাবে ধন্যবাদ দেব জানিনে। নিজের জীবন বিপন্ন করে আপনি আমার জীবন ও সম্মান রক্ষা করেছেন.........

আমি তাকে বক্তব্য শেষ করিতে দিলাম না। বলিলাম—

"আমাকে ধন্যবাদ দিতে হবে না, এ আমার কর্ত্তব্য।" তারপর তিরস্কারের স্বরে—আপনাদের আরেকটু সাবধানে চলা-ফেরা করা উচিত। সন্ধ্যাবেলা এমন স্থানে একজন বালককে সঙ্গে করে বেড়াতে আসা কখনো সঙ্গত নয়। ভেবে দেখুন ত, আজ কি কাণ্ডটাই না ঘটে যেত।

আমার ভৎর্সনা বাক্যগুলি তিনি নীরবে শুনিলেন। কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া থাকিয়া পরে বলিলেন—

"আপনার পরিচয়টা জানতে পারি কি?"

আমি আত্মপরিচয় দিলাম। আঙ্গুল হইতে একটা আংটী

খুলিয়া তিনি বলিলেন—"কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ যদি এইটী গ্রহণ করেন তবে……"

আমি বলিলাম—"আমি কোন পুরস্কারের আশা রেখে এ কাজ করিনি।"

"পুরস্কার নয়, এ আমার……"

"এ যাই হোক, আমি নিতে অক্ষম, সেজন্য আমি ক্ষমা চাই।"

আমি চলিয়া যাইতেছিলাম, তিনি একটু বিষণ্ণ কণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আংটী না হয় না নিলেন, কিন্তু দয়া করে আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ী পর্য্যন্ত যেতে পারেন কি? অন্ধকার হয়ে গেছে, এমন ঘটনার পরে আর একা যেতে সাহস হয় না।"

আমরা চলিতে সুরু করিলাম। আলাপে আলাপে জানিতে পারিলাম তারা খৃষ্টান, বহুকাল পূর্ব্বে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তিন চার পুরুষ যাবত খৃষ্টীয় ধর্ম্মমত অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন। তারা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। সহরের মাঝখানে গির্জ্জার পাশে খৃষ্টানপাড়ায় একটী দোতলা বাড়ীতে তিনি তার পিতা ও ছোট ভাইকে লইয়া বাস করেন। পূর্ব্বে কিছুদিন তিনি কলিকাতার এক মিসনারী স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাতার মৃত্যুর পর, বৃদ্ধ পিতার তত্ত্বাবধান করিবার দ্বিতীয় লোক না থাকায় তাকে বাধ্য হইয়া কাজ ছাড়িয়া বাড়ীতেই থাকিতে হইতেছে। তার বড় এক ভাই মাদ্রাজে কোন কলেজে

অধ্যাপকের কাজ করেন, আরেক বিবাহিতা ভগ্নী স্বামীর সঙ্গে সিমলায় থাকেন। এ ছাড়া তাদের আর কোন আত্মীয় বান্ধব নাই

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলিবার পর কয়েকটী ছোট রাস্তা অতিক্রম করিয়া একটী বড় রাস্তায় পড়িবামাত্র মোড়ের কাছে গির্জ্জার শ্বেত সৌধ ও তার পার্শ্বে বাদামী রংয়ের একটী ছোট দোতালা বাড়ী চোখে পড়িল। তিনি বাড়ীটার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—"এসে পড়েছি। এই যে আমাদের বাড়ী।"

গেটের ভিতর দিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম ইউরোপীয় পোষাকপরা একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ বয়সের চাপে সম্মুখের দিকে সামান্য ঝুঁকিয়া, পাইপ টানিতে টানিতে পাতলা অন্ধকারে পায়চারি করিতেছেন। তাকে দেখিয়া তিনি ডাকিয়া বলিলেন—

"বাবা, আজ একজন নূতন লোককে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এসেছি। তিনি যে কি ঘোর বিপদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন তা বলবার নয়।"

এই বলিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া আমাকে তার পিতার সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিলেন। আমরা ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলাম। ঘরটী প্রশস্ত না হইলেও বেশ সুরুচিসঙ্গতভাবে সাজান গুছান ছিল। মাঝখানে সুন্দর আচ্ছাদনে ঢাকা একটী গোল মেহগনির টেবিল। ইহার দুই

পাশে দুইটী সোফা। বামদিকে ভিতরে যাইবার দরজা পর্দা ঢাকা, বিপরীত দিকে দুইটী জানালা—জানালার ভিতর দিয়া বাহিরে একটী বাগান দেখা যায়। পিছনদিকের দেয়ালে দুই টবের মাঝখানে একটী প্রকাণ্ড আয়না। বাহির হইতে ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় ইহার মসৃণ বক্ষে প্রতি আগন্তুকের ছায়া প্রতিফলিত হয়। দেয়ালে দেশী ও বিলাতী কতকগুলি ছবি ঝুলান।

বৃদ্ধ একটী চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—"সুষমা যাও, চা করে নিয়ে এস।"

সুষমা হাসিয়া বসন্তাগমে আনন্দিত চিত্ত একটী ক্ষুদ্র পাখীর মত লঘু ত্বরিত গতিতে বামদিকের দরজা দিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এবং কিছুক্ষণ পরে একখানা ট্রে-তে করিয়া পেয়ালা, চামচ, চিনি প্রভৃতি লইয়া ফিরিয়া আসিল। চা ঢালা হইল, আমরা আলাপ করিতে করিতে পান করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধ আমার পাশে, সুষমা সম্মুখে। এক পেয়ালা শেষ হইবামাত্র আরেক পেয়ালা, তাহা শেষ হওয়া মাত্র পুনরায় আরেক পেয়ালার জন্য সে আমাকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। আলোকের সাহায্যে এবার আমি তার মুখখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইলাম। সে যে অসামান্যা রূপসী ছিল, এমন কথা বলিব না, কিন্তু তার

মুখের অবয়বগুলির ভিতর এমন এক প্রকার স্নিগ্ধ লাবণ্য ছিল যার মুগ্ধকরী শক্তি অনায়াসে দর্শকের মন জয় করিয়া লইতে পারিত।

প্রায় দেড় ঘণ্টাকাল আলাপের পর আমি বলিলাম—অনেকক্ষণ আলাপ করা গেল, এবার যাওয়া যাক।"

বৃদ্ধ বলিলেন—"হাঁ এবার যাবার সময় হয়েছে।"

সুষমা সম্মতি দিল। আমি ঘর হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে আসিলাম। সুষমা ও তার পিতা গেট পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। তাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়া রাস্তা ধরিয়া দু এক পা অগ্রসর হইয়াছি এমন সময় বৃদ্ধ ডাকিয়া বলিলেন—

"সুষমা, কয়েক পেয়ালা চা দিয়েই তোমার উদ্ধার কর্ত্তাকে বিদায় দিলে? কাল দুপুরে এখানে খাবার নিমন্ত্রণ করে দাও।"

সুষমা বলিল—"দয়া করে কাল দুপুর বেলা যদি খেতে আসেন, সুখী হব।" "অসুখীও আমি করতে চাই নে।"

তারপর তারা গৃহে ফিরিয়া গেলেন। আমি রাস্তা ধরিয়া চলিতে লাগিলাম। সে সময় পথে অন্য কোন পথিক ছিল না। শুধু দুই দিকের বাড়ীগুলি হইতে কয়েকটা কুকুর আমার পায়ের শব্দ শুনিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল আর সেই শব্দে সচকিত, সাবধানী গৃহস্বামীগণ মাঝে মাঝে দুয়ার হইতে

প্রশ্ন করিতেছিল—"কে যায়?" অল্প অল্প বাতাস বহিতেছিল। অন্ধকার শেফালির গন্ধে ভরিয়া উঠিয়াছিল। সেই সুঘ্রাণ বাতাসে নিঃশ্বাস টানিয়া আমার মন এক অনির্ব্বচনীয় সুখের অনুভূতিতে ভরিয়া উঠিল। কেন আমি অমন অনুভব করিয়াছিলাম? সুষমার পরিচয় লাভ করিয়াই কি? বলিতে পারি না। জীবনে এমন মুহূর্ত্ত আসে যখন সুখ বুকের ভিতর অজ্ঞাত কারণে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে থাকে, তখন কোন কারণ অন্বেষণ করিয়া সে-সুখ নষ্ট করিতে আদৌ ইচ্ছা হয় না। সেদিন অন্ধকার রাত্রে চলিতে চলিতে সেইরূপ একটা মুহূর্ত্ত আমার জীবনে আসিয়াছিল। সেই সুখাবেশে অর্দ্ধচেতন অবস্থায় ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক রাত্রে আমি বাড়ী পৌঁছিলাম।

[৫]

পরদিন বেলাতে ঘুম ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিলাম বিছানার উপর, মেঝেতে, দেয়ালে সকাল বেলার সোনালি রোদ কাঁপিয়া কাঁপিয়া খেলা করিতেছে। পূর্ব্বদিনের কথা মনে পড়িল। শুইয়া শুইয়া আগাগোড়া সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম—পাহাড়ের ধারে নির্জ্জনে সাক্ষাৎ, অন্ধকারে একসঙ্গে পথ চলা, ড্রয়িংরুমে বসিয়া চা খাওয়া ও কথোপকথন—ভাবিতে ভাবিতে সারা শরীরে একটা পুলক শিহরণ জাগিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই শিহরণ সুখ অনুভব

করিলাম—নাড়াচাড়া করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া দিবার ইচ্ছা হইল না। অবশেষে বিছানা ছাড়িয়া মনের স্ফূর্তিতে শিস্ দিতে দিতে বাহিরে গেলাম ও একটা কর্ক গাছের ছায়ায় বসিয়া চাকরকে চা লইয়া আসিতে বলিলাম। ক্ষীণোত্তাপ রৌদ্র ক্রমশঃ উজ্জ্বল ও সতেজ হইয়া উঠিল, সবুজ ঘাসের উপর সাদা সাদা শিশির কণাগুলি সোণালি, পীত, লালনীল প্রভৃতি বিচিত্র বর্ণের সমাবেশে ঝলমল করিতে লাগিল। আর সেই শিশিরবিন্দু পালকে মাখিয়া কলকণ্ঠ পাখীগুলি কখনো গাছের শাখায় চড়িয়া, কখনো মাটীতে নামিয়া আসিয়া খাদ্য আহরণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে নৃত্য গীতে মাতিয়া উঠিল। দেখিয়া মনে হইল যেন সকালবেলা আমারই মনের আনন্দ আকাশ ব্যাপিয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া গিয়াছে।

আমার আত্মীয়টী প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি ফিরিয়া আসিয়া আমার পাশে বসিলেন। বলিলেন—

"কি হে, আজ যে মুখে চোখে বড় আনন্দের ভাব দেখা যাচ্ছে, ব্যাপার কি ?"

বৃদ্ধকে আমার মনের কথা বলিবার ইচ্ছা ছিল না। বিশেষতঃ আমি তার ধাত জানিতাম—তিনি ছিলেন সেকেলে মানুষ, পুরাণো সংস্কারে তার মন ভরা। এ সব জিনিষ তিনি হয়ত সহ্য করিবেন না, বিশেষতঃ খৃষ্টান পরিবারের সঙ্গে পরিচয় তিনি বরদাস্ত করিবেন না। তাই আমি আসল কথাটা চাপিয়া

বলিলাম—"ব্যাপার কিছুই নয়। কাল রাত্রে খুব ভাল ঘুম হয়েছিল, আর ঘুম ভেঙ্গেই দেখি অমন সুন্দর সকালবেলা। এতে কার মনে না স্ফূর্ত্তি জাগে? আপনি ত এখানে এতদিন এসেছেন। রোজ সকালবেলা ত বেড়িয়ে বেড়ান। অমন সুন্দর সকাল দেখেছেন? দেখুন না, রোদে পাখীগুলি কেমন মনের আনন্দে নেচে বেড়াচ্ছে, কেমন মৃদু বাতাস দিচ্ছে..."

—"হু! আজ আর অমন বিশেষ সৌন্দর্য্য কি দেখলে? রোদে পাখী অমন রোজই নাচে। রোজ সকালে অমন মৃদু বাতাস দেয়। তুমি বেলা আটটা পর্য্যন্ত ঘুমুবে—তা রোজ আর তুমি দেখবে কেমন করে?—তোমার ঐ অভ্যাসটী বড় খারাপ। অত বেলা পর্য্যন্ত ঘুমুলে কি শরীর ঠিক থাকে? আমরা দেখনা ভোর বেলা উঠে অভ্যাস বলে আজ পর্য্যন্ত চলাফেরা করে বেড়াতে পারি। আমাদের বয়সে তোমরা অথর্ব্ব স্থবির হয়ে ঘরে বসে থাকবে।"

তিনি প্রায়ই আমার উপর এইরূপ মুরুব্বিয়ানা করিতেন আর তাদের সময়ের যুবকদের সঙ্গে বর্ত্তমান সময়ের যুবকদের আলোচনা করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। মাঝে মাঝে আমি তাকে কঠিন উত্তর দিতাম, সেইজন্য তিনি চটিয়া উঠিতেন।

বলিলাম—"আবার ঝগড়া বাধাতে চান?"

—"সত্যি কথা বল্লেই তোমার সঙ্গে ঝগড়া বাধে। আজ-

কালকার ছোকরাদের এই ত দোষ। বুড়োদের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ত নেই-ই, দুটো ভাল কথা বল্লে তাও গায়ে লাগে। যাক, তোমাকে আর আমি কিছু বলব না।"

এই বলিয়া তিনি রাগে গঠগঠ করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া গেলেন। জানিতাম একটু পরেই তার এই রাগ পড়িয়া যাইবে, আবার তিনি সুযোগ পাইলেই আমাকে সদুপদেশ দিবেন। তাই তার এই উষ্মা প্রকাশে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া আমি শুধু একটু মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া তার দিকে চাহিয়া রহিলাম।

দুপুর বেলা আমি সুষমাদের বাড়ীর গেটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বালক রণেন বাগানে একটা বকুল গাছের তলায় দাঁড়াইয়া মাথা উঁচু করিয়া কি একটা জিনিষ দেখিতেছিল। আমার আসার শব্দ শুনিয়া চোখ ফিরাইয়া বলিল—

"এসেছেন? এত দেরী হল যে? আমরা কখন থেকে আপনার অপেক্ষা করছি।"

"তাই নাকি?"—আদরের সহিত তার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলাম—চল ভিতরে যাই।"

ড্রয়িং রুমে ঢুকিলাম। রণেন ডাকিয়া বলিল—"দিদি উনি এসেছেন।" শুনিবামাত্র সুষমা আসিল, তার বাবাও আসিলেন। আবার সেই একই প্রশ্ন—এত দেরী কেন? কখন হইতে আমাকে আশা করিতেছেন।

আমি কৈফিয়ৎ দিলাম—ভবঘুরে মানুষ, সময়ের কি আর অত ঠিক থাকে? ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

খাইতে বসিলাম। খৃষ্টান পরিবার, ভাবিয়াছিলাম টেবিলে বসিয়া ইউরোপীয় ধরণে খানা খাইতে হইবে, কিন্তু মোটেই তা নয়। চিরাচরিত ভারতীয় প্রথানুসারে মাটীতেই আসন পাতা হইল। সুষমার বাবার পরণেও সেদিন আর বিদেশী পোষাক ছিল না। তিনিও আমার সঙ্গে বসিলেন। রণেনও বসিল। সুষমা পরিবেষণে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। সে যে এমন চঞ্চল প্রকৃতির কাল আমি তা টের পাই নাই। ছুটিয়া এ ঘরে যাওয়া, আবার ছুটিয়া আসা, কোন কিছুর দরকার হইলে আবার ছুটিয়া যাওয়া,—পরিপূর্ণা যুবতী, কিন্তু একেবারে বালিকার মত স্বভাব। আর তার লঘু রক্তিম ঠোঁটে হাসি সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে, যেন কোন পরম আদরের নবাগত অতিথির তুষ্টি সাধনে সচেষ্ট।

খাইতে খাইতে বৃদ্ধ বলিলেন—"জানেন, রমেশবাবু,—সুষমা শুধু আমার মেয়ে নয়, সে একাধারে আমার বোন, মা, বন্ধু, আমার সব, তার দয়ায় এক মিনিটের জন্য আমি কোন কিছুর অভাব অনুভব করতে পারিনে।"

সুষমার মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল—"বাবা যে কি বলেন!"

আমি বলিলাম—"কেন, মিছে কথা বলেছেন নাকি?"

—"না, মিছে কথা ত তিনি মোটেই বলেন না। পরিচিত অপরিচিত সকলের সামনেই মেয়ের প্রশংসা সুরু করে দেন।"

আমি বলিলাম—"প্রশংসা করার মত জিনিষ আছে বলেই প্রশংসা করেন।"

সুষমার বাবা বলিলেন—"বলুন ত রমেশ বাবু, তা না আমার মেয়েটী নিজের গুণ কেবল চেপে রাখতে চাইবে। আর অন্য কেউ তা প্রকাশ করে দিলে তার উপর ও রাগ করবে।"

সুষমা বাধা দিয়া বলিল—"থাক হয়েছে!"

—"হয়েছে কি! এখনো ত আমি তোমার সকল কথা বলিনি। জানেন রমেশবাবু সুষমা যে শুধু সুগৃহিণী তা নয়—"

সুষমা কৃত্রিম রোষের সহিত বলিল—"বাবা!"

বৃদ্ধ একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোমার ভ্রূকুটি দেখে ভীত হবার পাত্র আমি নই।" তারপর আমার দিকে চাহিয়া—"সে শুধু সুগৃহিণী নয়, গান গাইতে, সেলাই করতে ত জানেই, তাছাড়া কবিতা রচনাতেও কিছু কিছু হাত আছে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"সে ত কৃতিত্বের কথা,—তা গোপন করার চেষ্টা কেন?"

বাস্তবিক পিতা পুত্রীর পরস্পরের প্রতি এই আচরণ দেখিয়া মনে হইল যেন এরা সমবয়সী বন্ধু। বৃদ্ধ আমার সম্মুখে বিনা সঙ্কোচে সুষমার সহিত রসিকতা করিতে লাগিলেন,

সুষমা ললিত কণ্ঠে তীব্র মন্তব্যগুলিকেও যথোচিত কোমল করিয়া উত্তর দিতে লাগিল। এই বাদ প্রতিবাদ, উত্তর প্রত্যুত্তরের ভিতর দিয়া উভয়ের প্রতি উভয়ের যে সুনিবিড় শ্রদ্ধা ও স্নেহ প্রকাশ পাইতে লাগিল তাহা দেখিয়া আমার মন আনন্দে ভরিয়া উঠিল।

খাওয়া শেষ হইলে আমরা উঠিয়া পাশের ঘরে গেলাম। রণেন আমাদের কাছে বসিয়া শিশু-সরল মনে নানা রকম গল্প বলিতে লাগিল—স্কুলে মাষ্টার মশায় তাকে কেমন সকলের চেয়ে বেশী আদর করেন, কোন ছেলের সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পরীক্ষার সময় একটা ছেলে নকল করিতে গিয়া কি করিয়া ধরা পড়িয়া যায়, স্পোর্টে সে এবার কটা প্রাইজ পাইয়াছে ইত্যাদি। অল্পক্ষণ পরে সুষমাও খাওয়া দাওয়া শেষ করিয়া আসিল।

বৃদ্ধ বলিলেন—"এবার তোমার কবিতার খাতাটা দেখাও দেখি। ভাল সমঝদার লোক পেয়েছে—ওর মতের একটা মূল্য আছে। উনি কি বলেন শোন। আমি ওসব জিনিষ ভাল বুঝিও না ছাই!"

সুষমা বলিল—"তোমার যত কাণ্ড! উনি এখন খেয়ে-দেয়ে একটু বিশ্রাম করছেন, এখন একে ওসব ছাই ভস্ম দেখিয়ে বিরক্ত করে কি হবে?"

আমি বলিলাম—"না, না, আমার মোটেই বিরক্তি হবে না। আপনি নিয়ে আস্থন না। কবিতা পড়ে সময়টা বরং ভালই কাটবে।"

স্থষমা বলিল—"আপনিও বাবার কথায় ক্ষেপে উঠেছেন। ও সব কবিতা হয়েছে নাকি!"

রণেন বলিয়া উঠিল—"আমি গিয়ে নিয়ে আসছি।" এই বলিয়া সে ছুট দিল। স্থষমা তাকে বারণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তার আগেই সে ছুটিয়া গিয়া খাতাটা লইয়া আসিয়া আমার হাতে দিয়া দিল। সুন্দর বাঁধানো একটা খাতা—মলাটের উপর নাম লেখা শ্রীস্থষমা হালদার। আমি খুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। খাতাটার প্রায় অর্দ্ধেক কবিতায় ভরা—ছোট ছোট কবিতা, এক এক পৃষ্ঠায় এক একটা কবিতা শেষ। অধিকাংশই গীতি কবিতা, মাঝে মাঝে দুই একটা সনেটও আছে। অধিকাংশগুলিরই নাম দেওয়া—যেমন "বসন্ত শেষে", "শরতের নদী"; "নিভৃতে" ইত্যাদি। বিষয় প্রায় সবগুলিরই প্রাকৃতিক ঘটনা—কিন্তু শেষের শ্লোকে লেখিকার নিজের ও সাধারণ মানব জীবনের সহিত যোগ রহিয়াছে।

আমি যতক্ষণ পড়িতেছিলাম স্থষমা মাথা নীচু করিয়া আড় চোখে আমার পাতা উল্টান দেখিতেছিল। যখন শেষ কবিতাটা পড়িয়া আমি চোখ তুলিলাম সে মাথা নীচু রাখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—"কেমন লাগল?"

আমি বলিলাম—"বেশ হয়েছে। কোন কাগজে পাঠান নি?"

—"না। পাঠালে ছাপবে কি?"

—"কেন ছাপবে না! কাগজে কত রাবিশ ছাপা হয়। সে সবের তুলনায় আপনার কবিতা ঢের ভাল। আপনি পাঠাবেন। নিশ্চয় ছাপা হবে।"

এরপরে সাহিত্য লইয়া আলোচনা সুরু হইল। সুষমাকে বিধাতা শুধু শারীরিক সৌন্দর্য্যই দেন নাই; তার মনটাকেও নানা গুণে অলঙ্কৃত করিয়া গড়িয়াছিলেন। সে যখন আলাপ করিত, বুদ্ধির প্রভায় তার ললাট ও চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত; কিন্তু নিজের বিদ্যা জাহির করিবার কিছু মাত্র চেষ্টা তার মধ্যে ছিল না। কথা বলিতে বলিতে কোথায় থামিতে হইবে, কোথায় কতটুকু জোর দিতে হইবে, কিরূপে অন্যের মনে আঘাত না দিয়া নিজের মত বজায় রাখিতে পারিবে, তাহা সে সযত্নে শিখিয়া ছিল।

সে বলিল—"আমার মনে হয় সাহিত্যের সকলের চেয়ে বড় উদ্দেশ্য হয়েছে লোক শিক্ষা। যে রচনার কাজ শুধু আমোদ দেওয়া, যে-রচনা মানুষের মনকে কোন উন্নত জিনিষের চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে না, জীবনের সামনে কোন শ্রেষ্ঠ আদর্শ ধরে না সে-রচনার কোন স্থায়ী মূল্য আছে বলে মনে হয় না।"

আমি তার কবিতাগুলি পড়িয়াই বুঝিয়াছিলাম তার মনে সাহিত্য ও নীতির মধ্য একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। বলিলাম—"লোক শিক্ষাই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য বোধ হয় নয়। সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা আর আনন্দ দেওয়াই তার প্রধান কাজ। তবে কি জানেন? জীবনের উপর সৌন্দর্য্যের এমন একটা প্রভাব আছে যে, এর কাছে এলে মানুষের মন নীতি কথা ছাড়াও উন্নত হয়ে যায়। টুর্গেনেভ বলেছেন—Long live true art, by it the good is better and the bad is not all lost."

"কিন্তু সে প্রকৃত আর্ট হওয়া চাই।"

"নিশ্চয়ই। আর্টিষ্টের শক্তি যেখানে অল্প, রস-সৃষ্টিও সেখানে পরিপূর্ণ হয় না, সৌন্দর্য্য ও অঙ্গহীন থাকে। কাজেই তারা যদি বিষয় নির্ব্বাচনে সুরুচির পরিচয় না দেয়, তাদের রচনায় অনেক সময় কুফল ফলে থাকে।"

সুষমা আমার মন্তব্যগুলি বিনা প্রতিবাদে মানিয়া লইল। বুঝিতে পারিলাম একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি মনে করিয়া এরই মধ্যে সে আমাকে শ্রদ্ধা ও প্রশংসার চোখে দেখিতে সুরু করিয়াছে। আমার কাছে পরাজয় স্বীকার করিয়াও যেন সে আনন্দ পাইতেছে। সে বলিল তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে অনেক রকমের প্রশ্ন উঠে, কিন্তু সে তার কোন মীমাংসা করিতে

পারে না। অনেকের সঙ্গে কথা বলিয়া সে এইটুকু বুঝিয়াছে যে সংসারের বেশীর ভাগ লোকই স্বাধীন চিন্তার কষ্ট স্বীকার করিতে রাজী নয়।

ক্রমে বিকাল বেলা আসিয়া পড়িল। আমি বলিলাম—"এইবার আমাকে যেতে হবে।" কিন্তু সকলেই বলিয়া উঠিল—"বিকাল বেলা চা না খেয়ে যাবেন কি?" আমি তাদের অনুরোধ এড়াইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। এইবার আমরা ঘর ছাড়িয়া বাহিরে বাগানে ঘাসের উপর আসিয়া বসিলাম। আবার চা তৈয়ার হইয়া আসিল। আমরা আস্তে আস্তে গল্প করিতে করিতে চা পান করিতে লাগিলাম। বিকালবেলার রোদ গাছের ফাঁকে ফাঁকে আমাদের চারিদিকে ঘাসের উপর পড়িয়া খেলা করিতেছিল। ঠাণ্ডা বাতাস উঠিল—মাটী না ছুঁইয়াই, গাছের পাতাগুলিকে সামান্য দোলা দিয়া বহিতে লাগিল। আমরা গল্প করিতে লাগিলাম—এই বাতাসেরই মত শান্ত স্বরে। ক্রমে ঘাসের উপর হইতে রোদ সরিয়া গেল। ছায়া নামিতে লাগিল। বাতাসের বেগ বাড়িয়া যাওয়ায় পাতায় পাতায় কলসঙ্গীত বাজিয়া উঠিল। হঠাৎ দিবা রাত্রির এই মোহন মিলনক্ষণে অদূরবর্ত্তী গির্জ্জা হইতে ধীর গম্ভীর নাদে দিবা শেষের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—এক নিমেষে আমাদের সকলের মধ্যেই একটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। আমরাও

গল্প ছাড়িয়া যেন মহান্ কোন কিছুর প্রভাবে গম্ভীর হইয়া উঠিলাম।

ঘণ্টার শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতে আসিতে শেষে থামিয়া গেল। আমরা আবার গল্প করিতে লাগিলাম। আরো প্রায় ঘণ্টা খানেক গল্প করিয়া অবশেষে আমি বিদায় লইয়া বাড়ীর দিকে চলিলাম।

বিদায়ের সময় সুষমা বলিল—"মাঝে মাঝে আসবেন ত?"

আমি বলিলাম—"নিশ্চয়ই।"

সেদিন রাত্রে ঝিলের পাশ দিয়া বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে মনে মনে প্রশ্ন করিলাম—এর শেষ কোথায়?

[৬]

সুষমাদের সঙ্গে পরিচয়টা ক্রমেই নিবিড় হইয়া উঠিল। আমি প্রায়ই তাদের বাড়ী যাইতে আরম্ভ করিলাম। তারা আমাকে নিজেদের একজনেরই মত মনে করিত। আমিও তাদের সরল আচরণে এমন মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম যে কোনরূপ সঙ্কোচ অথবা ব্যবধান অনুভব করিতাম না। প্রথমে সপ্তাহে দুই তিন দিনের বেশী যাইতাম না। কিন্তু পরে এমন হইল যে প্রতিদিন বিকালবেলা আর কোথাও যাওয়ার সঙ্কল্প করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলেও অবশেষে নিজের অলক্ষিতে সুষমাদের বাড়ীতে আসিয়া উপনীত হওয়া অভ্যাসে দাঁড়াইয়া গেল। সুষমার বাবা

আমাকে সর্ব্বদা তার স্বভাবগত কোমল হাসি দিয়া অভ্যর্থনা করিতেন, সুষমার মুখও আমাকে দেখিয়া আনন্দে রক্তিম হইয়া উঠিত। আর ক্ষুদ্র বালক রণেন—সে তার রমেশদাকে এমন ভালবাসিত যে একদিন কোন কারণে না গেলে পরদিন সে ছুটিয়া আমার বাংলোতে আসিয়া উপস্থিত হইত এবং জোর করিয়া আমাকে তাদের বাড়ীর দিকে টানিয়া লইয়া যাইত।

দোতালায় রণেনের পড়িবার ঘরের সামনে একটা চত্বর ছিল, বিকালবেলা আমরা সাধারণতঃ সেখানে বসিতাম। সামনে সন্ধ্যার আলো ক্রমশঃ ধূসর হইয়া আসিত, বাতাসের আঘাতে বাগানের গাছগুলি দুলিতে থাকিত, শাখায় শাখায় পাখীরা ডাকিত, আকাশ হইতে রাত্রির শীতলতা নামিয়া আসিত,—আর আমরা সেখানে বসিয়া হাসিতাম, গল্প করিতাম, সময় যে কোথা দিয়া চলিয়া যাইত সে খেয়াল থাকিত না।

প্রায় একমাস এইরূপে কাটিয়া গেল। ব্যাপ্তির দ্বারা বিচার না করিয়া শুধু অনুভূতির প্রগাঢ়তা দিয়া বিচার করিলে বলিব, এই সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের মধ্যে মাত্র এই ত্রিশদিনই আমি যথার্থ জীবন যাপন করিয়াছি। এই ত্রিশদিনের ইতিহাস যেন একটা স্বপ্নের কাহিনী। এই ত্রিশ দিনের মেলামেশায় আমরা দুইজনেই বুঝিতে পারিলাম আমরা পরস্পরের অনেকখানি কাছাকাছি আসিয়া গিয়াছি, কিন্তু মুখ ফুটিয়া এ পর্য্যন্ত কেহই কারো কাছে নিজের

মনের কথা খুলিয়া বলি নাই। একদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়া দেখি সুষমা একা জানালার ধারে বসিয়া কি একটা সেলাই করিতেছে। তার বাবা ও রণেন বাড়ীতে ছিল না। সেইদিন তার কাছে মনের কথা খুলিয়া বলিব মনে করিয়াছিলাম, এ-কথা সে-কথা দিয়া কথাটা পারিতেও যাইতেছিলাম, কিন্তু ঠিক সেই সময় সিঁড়িতে ঠক্ ঠক্ শব্দ হইল; আর বলা হইল না, একটু পরেই রণেন ও সুষমার বাবা ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন তাদের অনুপস্থিতিতে ঘরে তার মেয়ের সঙ্গে আমাকে একা দেখিয়া, তিনি হয়ত তত সন্তুষ্ট হন নাই। মুখে তিনি কিছুই বলেন নাই, কিন্তু এমন ভাবে তিনি আমার দিকে চাহিলেন যে তাতে আমি তার মনের ভাব পড়িতে পারিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে পূজার ছুটীতে সুষমার ভাই খগেনবাবু বাড়ী আসিলেন। সঙ্গে আসিল তাদের কলেজের সহকর্ম্মী বন্ধু জনৈক মান্দ্রাজী যুবক। তাদের আঁসার পর হইতে সর্ব্বদা সুষমার সঙ্গ নিবিড় ভাবে উপভোগ করিবার সৌভাগ্য আমার আর ঘটিয়া উঠিত না। তাকে প্রায়ই তার দাদার ও নবাগত অতিথির সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইত। অনেক সময় সে তাদের সেবায় এমন ব্যস্ত থাকিত যে তাকে কোন প্রশ্ন করিলে তার উত্তর দেওয়া ব্যতীত অন্য কথা বলিবার অবকাশ পর্য্যন্ত যেন সে খুঁজিয়া পাইত না।

খগেনবাবু লোকটীকে আমার বেশী ভাল লাগিত না। এমন অনেক মানুষ আছে যাকে প্রথম দেখিলেই মনে প্রীতির সঞ্চার হয়, আবার এমন অনেক আছে যাকে দেখিলেই মনে হয় যেন এর ছায়া না মাড়াইয়া চলিলেই ভাল। এই সহজ আকর্ষণ বিকর্ষণের কোন কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। মন যেন আপনা হইতে কিসের আভাস পাইয়া সতর্ক হইয়া উঠে। খগেন বাবুকে যে মুহূর্ত্তে আমি প্রথম দেখি সেই মুহূর্ত্তেই আমার মন এই সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়াছিল। খগেনবাবুও যেন প্রথমদর্শনক্ষণ হইতেই আমার প্রতি এই বিকর্ষণভাব অনুভব করিয়াছিলেন। সেইজন্য যখন আমি তাকে নমস্কার করিলাম, তিনি আমাকে যে প্রতি নমস্কার করিয়াছিলেন তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিল না। বরং নমস্কার করিতে গিয়া এমন চোখে আমার দিকে চাহিয়া ছিলেন যে ভাবটা এই—এই অজ্ঞাতকুলশীল লোকটী এখানে কি করিয়া জুটিল ?

মান্দ্রাজী যুবকটীও যে আমাকে ভাল চোখে দেখিত এ কথা বলিতে পারি না। কিন্তু তার আমাকে ভাল চোখে না দেখিবার কারণ ছিল। আমি সুষমার সঙ্গে মিশিয়াছি, এখনো মিশিতেছি এ জিনিষটা সে পছন্দ করিত না। কারণ সেও মনে মনে সুষমার সম্পর্কে একটী আশা পোষণ করিত—আর সে আশার বীজ তার মনের মধ্যে রোপণ করিয়া দিয়াছিল খগেনবাবুই।

সেইজন্য সে গত দুই বৎসর ধরিয়া ছুটীতে ছুটীতে খগেন বাবুর সঙ্গে এখানে বেড়াইতে আসিতেছিল।

তাদের অনুপস্থিতিতে আমি এই পরিবারের সঙ্গে ঘটনা-চক্রে পরিচিত হইয়াছিলাম, কাজেই আমাকে ভাল না লাগিলেও আমার উপস্থিতি তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইত—বিশেষতঃ কি করিয়া আমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে তাহা জানিয়া শুনিয়া আমাকে সহ্য করিয়া যাওয়া ছাড়া তাদের উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু প্রতিদিন বিকাল বেলা যখন চত্বরের উপর বৈঠক বসিত তখন খগেন বাবু ও তার বন্ধু—বিশেষ করিয়া তার বন্ধু—কথায় বার্ত্তায় সর্ব্বদা আমাকে দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিত। যে তর্ক হইত, যে আলোচনা হইত, তাতে আমি কোন কথা বলিলে, কিংবা মত প্রকাশ করিলে সে দ্বিগুণ জোর গলায় সেই মতের বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া, কিংবা সেই মত সংশোধন করিয়া নিজের প্রাধান্য জাহির করিতে চেষ্টা করিত। আমি বুঝিতাম সুষমার কাছে আমাকে ছোট করিয়া নিজকে বড় করিবার জন্যই সে অমন করিত। খগেনবাবু অতদূর না গেলেও সূক্ষ্মভাবে আমাকে একটু উপেক্ষার ভাব দেখাইতে চেষ্টা করিতেন।

আমি যে তাদের আসার পর হইতে অসোয়াস্তি বোধ করিতাম সে কথা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া সহ্য করিয়াও আমি যাইতাম একটা আকর্ষণে,—সুষমার জন্য।

এই মোহিনী বালিকা আমার উপর এমনই মায়া বিস্তার করিয়াছিল যে মনে হইত তার জন্য শুধু ইহা কেন, আরও অনেক কিছু সহ্য করিতে পারি। এতটুকু ভাবিবার মত বল মনে পাইতাম শুধু এই চিন্তা করিয়া যে কোনদিন মুখ ফুটিয়া হাঁ না বলিলেও কোন আচরণ দ্বারা সে আমার ভুল ভাঙ্গিতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু শীঘ্রই নব অতিথির সঙ্গে সুষমার ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া আমি মনে মনে পীড়া অনুভব করিতে লাগিলাম। এতদিন মনে হইত যেন তারা দুইজনে সুষমাকে আমার নিকট হইতে আড়াল করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, হয় ত সুষমার তাতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এখন মনে হইল সুষমাই যেন ইচ্ছা করিয়া তাদের দুইজনের আড়ালে থাকিতে ভালবাসিত। আজকাল প্রায়ই তারা আজ চড়ুই ভাতি খাইতে বাহির হইয়া যাইত, কাল এই বনে, আরেক দিন ঐ পাহাড়ে বেড়াইতে যাইত। আমার পক্ষে সুষমার দেখা পাওয়া পর্য্যন্ত মুস্কিল হইয়া উঠিল।

আমার মনে হইল সুষমার নিকটও যেন আমার আদর কমিয়া গিয়াছে। এইরূপ অনাদৃত ভাবে তাদের সঙ্গ-সুখ খুঁজিবার জন্য সেখানে যাওয়া আমার নিকট আর সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। সেইজন্য সুষমাদের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম। যে পাহাড় জঙ্গলকে এতদিন সুষমার জন্য একরকম ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আবার আমি তাদের সংসর্গে ফিরিয়া

গেলাম। আবার আমার দৈনিক জীবন অনেকটা প্রথম অবস্থায় ফিরিয়া আসিল। কিন্তু আমার পূর্ব্বের মন আর ছিল না, সেইজন্য ফিরিয়া আসিয়াও আমি নদী গিরি বনের মধ্যে আর পূর্ব্ব আনন্দ খুঁজিয়া পাইতাম না। যখনই আমি ছুটিয়া বনের মধ্যে যাইতাম, সুষমার স্মৃতি আমার পথের উপর ছায়া নিক্ষেপ করিয়া আমাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। অনেক সময় মনে হইত আবার ছুটিয়া গিয়া একবার তাকে দেখিয়া আসি, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে দমন করিয়া রাখিতাম।

প্রায় দিন দশ পরে একদিন আমি বেড়াইয়া ফিরিতেছি, দেখি রাস্তা ধরিয়া খগেনবাবু, মাদ্রাজী যুবকটী ও সুষমা আসিতেছে। খগেনবাবুর পাশে মাদ্রাজীটী ও তার পাশে সুষমা। তারা যদি আমাকে দেখিতে না পাইত, তাহা হইলে তাহাদিগকে এড়াইয়া অন্য রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতাম, কিন্তু বুঝিলাম তারা আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, সেইজন্য আমি আগাইয়া চলিলাম। নিকটে আসিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিলাম। মাদ্রাজীটী ভদ্র হাসি হাসিয়া প্রতি নমস্কার করিল। খগেনবাবুও ভদ্রতার খাতিরে একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—'ভাল আছেন ত?'

আমি চলিয়া যাইতেছিলাম। সুষমা ডাকিয়া বলিল—"আপনি আর আজকাল যান না যে?"

আমি সুষমার দিকে চাহিয়া দেখিলাম—তার মুখখানা যেন

ইতিমধ্যে একটু মলিন হইয়া গিয়াছে, যে-হাসি সে আমাকে দেখিয়া হাসিল তাতেও যেন বিষাদ মাখা।

আমি কি উত্তর দিব ভাবিয়া পাইলাম না। কিন্তু আমার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই সে বলিল—"কাল সন্ধ্যাবেলা একবার আসবেন ?"

দেখিলাম তার এই অনুরোধটা অন্য দুইজনের মনঃপূত হইল না। কিন্তু তার প্রশ্নের ভঙ্গীতে মনে হইল যেন তার কিছু বলিবার আছে। আমি বলিলাম—"আচ্ছা।"

তারপর তারা চলিয়া গেল। আমিও আমার পথ চলিতে লাগিলাম।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আমি আবার সুষমাদের বাড়ী গেলাম। চত্বরে প্রতিদিনের মত সেদিনও সকলে বসিয়া আলাপ করিতেছিল। আমি যাইবামাত্র সুষমার বাবা বলিলেন—"এই যে আসুন, বসুন" এই বলিয়া তার পাশের বেতের চেয়ারটা ঠেলিয়া দিলেন। তারপর বলিলেন—"আমাদের একবার চা খাওয়া হয়ে গেছে, সুষমা রমেশবাবুর জন্য আবার চা বানাও।" সুষমা প্রশ্ন করিল শুধু একজনের মত চা-ই তৈয়ার করিবে না অন্যেরাও আবার খাইবে। খগেনবাবু বলিলেন—"যদি হয় আপত্তি নেই।" মাদ্রাজীটী বলিল—"নিশ্চয়ই নয়।" বলিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। চত্বরেই ষ্টোভ, চা,

পেয়ালা সমস্তই ছিল। সুষমা জল গরম করিবার জন্ত ষ্টোভ ধরাইল।

বৃদ্ধ প্রশ্ন করিলেন—"তারপর রমেশবাবু, এতদিন দেখিনি যে? এখানে ছিলেন না বোধ হয়?"

প্রশ্নটা আমার ভাল লাগিল না। আমার মনে হইল, কেন আজকাল আসি না তাহা তিনি এবং আর সকলেই জানেন, এবং জানিয়া শুনিয়াই আমাকে এই প্রশ্ন করিতেছেন। তবু মনের বিরক্তি চাপিয়া বলিলাম—"এখানেই ছিলাম। একটু কাজ ছিল তাই আসতে পারি নি।"

মান্দ্রাজীটী বলিল—"ও! কাজ ছিল। তবু ভাল, আমরা ভাবলাম রমেশবাবুর কি জানি হয়েছে, সেইজন্যই আসছেন না।"

এই বলিয়া তিনি শত্রু-পরাভবের আনন্দে একটু চাপা কুটিল হাসি হাসিলেন। আমার ইচ্ছা হইল তার গালে একটা চড় বসাইয়া দিয়া তখনই সেখান হইতে সরিয়া পড়ি, কিন্তু আমি আসিয়াছিলাম সুষমার অনুরোধে, শুধু তার কথা মনে করিয়া নিজেকে সংযত করিয়া রাখিলাম।

সুষমা আবার সকলকে চা পরিবেশন করিল। চা খাইতে খাইতে একটা তর্ক আরম্ভ হইল। তর্কের বিষয় ছিল বর্ত্তমান-কালের রাজনীতি লইয়া। প্রায় এক ঘণ্টাকাল তর্কের ঝড় চলিল। বলা নিষ্প্রয়োজন যে তর্কের মধ্যে খগেনবাবু আর

মান্দ্রাজী যুবকটী ছিল এক দিকে, আর আমি এক দিকে। সুষমার বাবা কোন পক্ষই নেন নাই, তবে মাঝে মাঝে যখন আমার যুক্তির প্রবলতা সত্ত্বেও অপর পক্ষ আমাকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন তিনি আমার পক্ষে দুই একটী কথা বলিতেছিলেন। সুষমা যোগ দেয় নাই—তার মন যেন ভারাক্রান্ত বোধ হইতেছিল। সে কখনো চুপ করিয়া শুনিতে-ছিল, কখনো যেন অস্বস্তি বোধ করিয়া এদিকে ওদিকে হাঁটিতে-ছিল, কখনো আলিসার ধারে গিয়া কিছুক্ষণ দূরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া ফিরিয়া আসিয়া আবার বসিতেছিল। আমি বুঝিতে-ছিলাম সে এই তর্ক মোটেই পছন্দ করিতেছে না, কিন্তু অন্যেরা কেউ কিছু বলিতেছিল না দেখিয়া আমিও কিছু বলি নাই।

অবশেষে তর্ক শেষ হইল। তখন রাতও খানিকটা হইয়া-ছিল। সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম। কিন্তু দেখিলাম, সুষমা নাই, এই ফাঁকে সে সরিয়া গিয়াছে। কেহই তার অনুপস্থিতি উপলব্ধি করে নাই। তার সঙ্গে দেখা না করিয়া চলিয়া যাইতে হইবে মনে করিয়া কষ্ট হইল, কিন্তু কাকেও তার সম্বন্ধে কোন কথা না বলিয়া, শুধু একটু অপেক্ষা করিয়া, আমিও আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলাম।

নীচে নামিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি বাগানটা পার হইয়া যাইব

এমন সময় আড়াল হইতে সুষমা ছুটিয়া আসিয়া আমাকে বলিল—"চলে যাচ্ছেন ?"

আমি থামিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম সে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া আছে, যেন কি বলিতে চায়।

বলিলাম—"কেন, কোন কথা আছে ?"

সে মাথা নীচু করিয়া আস্তে আস্তে বলিল—"ছিল। কিন্তু"—তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"চলুন না, একটু ও-দিকটায় যাই।"

আমরা যেখানটায় দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখানটায় উপর হইতে আমাদের উপর একটু আলোক পড়িতেছিল, কিন্তু যেদিকটায় সে নির্দ্দেশ করিল সেখানে গাছের ছায়ায় অন্ধকার ছিল, আর উপর হইতে আমাদিগকে সেখানে দেখিবারও সম্ভাবনা ছিল না।

আমি বলিলাম—"চলুন।"

গাছের ছায়ায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি কথা বলুন ত ?"

সে আরো কিছুক্ষণ মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—"অনেক দিন থেকেই জিজ্ঞেস করব মনে করেছিলাম, কিন্তু বড়ই—" বলিতে বলিতে সে থামিয়া গেল। তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"তুমি কি কিছুই বুঝতে পাচ্ছ না ?"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। এই সে প্রথম আমাকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল। যে কথাটা আমিই তাকে প্রশ্ন করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, যে-প্রশ্ন করিতে আমিই সঙ্কোচ বোধ করিতেছিলাম, একদিন সঙ্কোচ অতিক্রম করিয়া যে প্রশ্ন করিতে গিয়া আমি বাধা পাইয়া চাপিয়া গিয়াছিলাম, সেই প্রশ্নটা যখন তারই মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিল, তখন আমি যেমন শরীরের ভিতর এক অপূর্ব্ব শিহরণ অনুভব করিলাম, তেমনই সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তর দিতেও কেমন বাধ বাধ ঠেকিল। কয়েকবার ঢোক গিলিয়া অবশেষে বলিলাম—"একদিন ভেবেছিলাম, যা মনে মনে ভাবছি হয় ত তা সত্যিই,—"

—"একদিন! এখন কি সন্দেহ হচ্ছে?"

—"না সন্দেহ, নয় তবে—?"

—"তবে?"

—"তবে তুমি কি ততদূর যেতে রাজী আছ?"

কথাটা বোধ হয় সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। সে মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিল। আমি বলিলাম— "তোমার দাদা আমাকে কি চোখে দেখেন জান ত? তার আবার একটী বন্ধুও আছে...তার মনও ত তোমার অজানা নয়। তোমার কি অতটা—"

'তুমি যদি রাজী থাক, আমিও রাজী।"

আনন্দে আমি সুষমার হাতটা বুকের কাছে টানিয়া আনিলাম। সেই অবস্থায় আমরা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে অন্ধকার দূর করিয়া পাহাড়ের আড়াল হইতে চাঁদ উঠিল। রূপালি আলোক রাশি ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইয়া চারিদিকের সমস্ত ভূমি প্লাবিত করিয়া দিল। শুধু আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখানটা পরিষ্কার হইল না, অন্ধকার কিছু পাতলা হইল মাত্র।

আমি আস্তে আস্তে ডাকিলাম—'সুষমা?'

সে অতি নরম ভাবে উত্তর দিল—"কি?"

কিন্তু আমি তাকে কি বলিব ভাবিয়া পাইলাম না। বৃহৎ আনন্দের সম্মুখীন হইলে মানুষ বোবা হইয়া যায়। আমি শুধু চুপ করিয়া তার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

হঠাৎ উপর হইতে ডাক আসিল—"সুষমা?"

তার চমক ভাঙ্গিল। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—"এবার যাই।" তারপর বেগে ভিতরে চলিয়া গেল।

আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া তার বিলীয়মান মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিলাম। যখন দরজার অন্তরালে আর তাকে দেখা গেল না, তখন আস্তে আস্তে ফটকের ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসিলাম। আমি আনমনে পথ চলিতে

লাগিলাম। সব জিনিষই আমি দেখিতেছিলাম, কিন্তু কোন জিনিষের প্রতিই আমার মন ছিল না। আনন্দের নেশায় তখন আমার মনের সেই অবস্থা যে-অবস্থায় মানুষ চেতন থাকিয়াও অচেতনের মত চলে। এ পথে সে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে ঝিলের পাশে আসিলাম। ঝিলের তীর তখন শূন্য। শুধু তীরজ গাছগুলি মৃদুমন্দ দুলিতেছিল আর ছোট ছোট ঢেউগুলি কলতান তুলিয়া কচি ঘাসে ঢাকা তীরের উপর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। মিষ্ট বাতাসে সামান্য শীতের আমেজ মাখা ছিল।

আনন্দের চঞ্চলতায় আমি যে কি করিব স্থির করিতে পারিলাম না। বাড়ী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। মনে হইল শুধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াই।

অনেকক্ষণ ঘুরিয়া আবার অজ্ঞাতসারে সুষমাদের বাড়ীর কাছে আসিয়া হাজির হইলাম। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে। দেখিলাম দরজা জানালা সব বন্ধ, বাড়ীর সকলেই নিদ্রামগ্ন। আস্তে আস্তে বাড়ীটার চারিদিকে ঘুরিলাম, কোথাও জাগরণের চিহ্ন নাই। তবু এ স্থান ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা হইল না। ভ্রমর যেমন করিয়া ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় আমি সেইমত বারবার ইহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

হঠাৎ একটা ঘরের জানালা খুলিয়া গেল, আলো জ্বলিয়া

উঠিল। জানালার কাছে একটী মূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি সুষমা,—তার চুলগুলি অবিন্যস্ত, শাড়ীটা নিতান্ত অযত্নের সহিত গায়ে জড়ান, দুই হাতে জানালার দুইটা গরাদ ধরিয়া দূরে চাহিয়া আছে।

নিকটে গিয়া ডাক দিব মনে করিতেছি এমন সময় সে জানালা হইতে সরিয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই ভিতরে অর্গান বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে সুষমার কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। পরিচিত কণ্ঠ, কিন্তু এখন যেন আমি তাতে পরিবর্ত্তন অনুভব করিলাম। আনন্দের ক্ষণে তার গলায় গান শুনিয়াছি—সে গলা অতি মিষ্ট। এখন সে একটী দুঃখের গান গাহিতেছিল—তাতে যেন তার গলা আরো বেশী খুলিয়া গিয়াছিল। এই গলায় এত আবেগ, এত মত্ততা, এত বিষাদের মিষ্টতা ছিল তা ত আমার জানা ছিল না। কিন্তু এ বিষাদের কারণ কি? সে কি প্রতিদিন নিশীথের অন্তরালে নিজের মনের ব্যথাকে সঙ্গীতের সাহায্যে মুক্তি দেয়, অথবা শুধু আজই সে এরূপ করিতেছে?

আমি চুপ করিয়া শুনিতে লাগিলাম। সুরের তরঙ্গ একটী একটী করিয়া আকাশের দিকে উঠিতে লাগিল। আওয়াজ কখনো উচ্চ গ্রামে উঠিয়া সহসা খাদে নামিয়া আসিল, তারপর আবার ধীরে ধীরে উচ্চে উঠিতে লাগিল। এইরূপ প্রায় আধ

ঘণ্টা কাল চলিল। তারপর আওয়াজ থামিয়া গেল। আলো নিবিয়া গেল। আমি সঙ্গীতের রেশে প্রাণ ভরিয়া আবার এ পথে সে পথে ঘুরিতে ঘুরিতে ভোরবেলা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

মৃতের মত পড়িয়া পড়িয়া অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া যখন জাগিলাম তখন দুপুর পার হইয়া গিয়াছে। উঠিতে ইচ্ছা হইল না। জাগিয়া থাকিয়াই আরো কিছুক্ষণ বিছানায় শুইয়া রহিলাম। চাকর আসিয়া দুইবার ডাকিয়া গেল। তাই অবশেষে হাই তুলিতে তুলিতে উঠিয়া স্নান করিতে গেলাম।

বৃদ্ধ স্নান করিয়া বসিয়াছিলেন, তখনো খাওয়া দাওয়া করেন নাই। আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। দুইজনে এক সঙ্গে খাইতে বসিলাম। খাইতে খাইতে তিনি আমাকে বলিলেন—

"খুব ঘুমটা ঘুমিয়েছ ত যা হোক। একেবারে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা। বাপরে বাপ! সকালবেলা তোমার উঠ্‌তে দেরী দেখে আমি একবার দরজার নিকটে দাঁড়িয়ে ডেকেছিলাম। কিন্তু তুমি যে রকম নাক ডেকে ঘুমুচ্ছিলে, তা আমার ডাক তোমার কাণে যাবে কেন?"

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"একটী ছেলে আজ সকালবেলা এসে একটা চিঠি দিয়ে গেছে। তুমি

তখন ঘুমুচ্ছিলে। আমি ছেলেটীকে একটু বসতে বলেছিলাম, কিন্তু সে কিছুতেই বসলে না। শুধু বল্‌লে—উনি উঠ্‌লে ওকে চিঠিটা দেবেন। চল, খেয়ে উঠে তোমাকে চিঠিটা দিচ্ছি। শিরোনামা দেখে মেয়েলি লেখা বলে মনে হ'ল।"

আহারের পরে তিনি চিঠিটা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"এই নাও চিঠি। পড়ে যদি বলবার মত হয় বলো। আমি এখন একটু শুতে চল্‌লাম।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

আমি চিঠিটা হাতে লইয়া খুলিবার আগে শিরোনামাটা কিছুক্ষণ মন দিয়া দেখিলাম। গোটা গোটা অক্ষরে আমার নাম লেখা, সুষমার হস্তাক্ষর চিনিলাম। কিন্তু লেখার টানের মধ্যে দৃঢ়তা ছিল না। মনে হইল লিখিবার সময় তার মন সহজ শান্ত অবস্থায় ছিল না, তাই লিখিতে গিয়া হাতটা নড়িয়া যাইতেছিল। খুলিতে একটু কেমন বাধ বাধ ঠেকিল—চিঠিটা দুইটা আঙ্গুলের মধ্যে চাপিয়া চোখের সামনে তুলিয়া ধরিলাম। খামের পাতলা কাগজের ভিতর দিয়া ভিতরের ফিকে লাল চিঠির কাগজটা দেখা গেল—কাগজটা যে ভাঁজ করিয়াছে তার মধ্যেও যেন লিখিবার কালের মনের অবস্থা ধরা পড়িতেছিল।

অবশেষে খামটা আস্তে আস্তে ছিঁড়িয়া, আরো আস্তে

আস্তে ভিতর হইতে চিঠিটা খুলিয়া পড়িলাম। তাহাতে লেখা ছিল—

“কাল রাত্রে যা বলিয়াছিলাম তা হইবার নয়। দাদা সমস্ত জানিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় জীবনের মত ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।—সুষমা।”

চিঠিটার দুই এক স্থানে অক্ষরগুলিতে জল লাগিয়া কালী একটু গুলিয়া গিয়াছিল। বোধ হয় লিখিতে লিখিতে তার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

চিঠিটা পড়িয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলাম। এলোমেলো অনেক কথা মনের মধ্যে উদিত হইল। আবার চিঠিটা পড়িলাম। এই অল্প দিনের প্রবাসে, অদৃষ্টের ষড়যন্ত্রে যাকে বুকের এত কাছে পাইয়াছিলাম, অদৃষ্টের ষড়যন্ত্রে আবার তার সঙ্গে জন্মের মত ছাড়াছাড়ি হইয়া যাইবে—ভাবিতে চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। এইজন্যই তবে সে কাল গভীর রাত্রে নিদ্রিত পৃথিবীর বাতাস বিষাদের সুরে ভরিয়া তুলিতেছিল। তার দাদারই অবশেষে জয় হইল। তিনি যে আমাকে ভাল চোখে দেখিতেন না জানিতাম, সুষমা যে তাকে ভয় করিয়া চলে তাও দেখিতাম। কিন্তু মনে করিয়াছিলাম হয়ত সে তার দাদার শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারিবে, কিন্তু তা আর সে তবে পারিল না!

বসিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ এই সব কথা ভাবিলাম। তারপর আর ভাল লাগিল না, উঠিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম। গাছের ছায়ায় ছায়ায় অন্য মনস্ক ভাবে চলিতে-লাগিলাম। সুষমাদের বাড়ীর দিকে যাইব মনে করি নাই, কিন্তু তবু কি জানি কেমন করিয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে-লাগিলাম। গির্জ্জাটার কাছে আসিয়া একবার থামিলাম। মনে করিলাম যাইব না, যা কিছু বলিবার বাড়ীতে গিয়া চিঠি লিখিয়া জানাইব। কিছুদূর পথ বাড়ীর দিকে আসিলাম। কিন্তু আসিতে আসিতে আবার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার আস্তে আস্তে ফিরিয়া চলিলাম। বাড়ীটার কাছে আসিয়া সঙ্কোচ বশতঃ একটু দাঁড়াইলাম। তারপর গেট-ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

কিন্তু বাড়ীর দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। দিনের বেলা দরজা জানালা সমস্ত বন্ধ, কোথাও জনপ্রাণীর সাড়া নাই। কাছে গিয়া দেখিলাম দরজায় তালা দেওয়া। ব্যাপার কি বুঝিতে পারিলাম না।

আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তিত মনে গেটের দিকে ফিরিয়া যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম, বাড়ীর দারোয়ান ভিতরে ঢুকিতেছে। আমি তাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলাম, বাড়ীতে তালা দেওয়া কেন, সকলে কোথায় গিয়াছে?

সে বলিল আজ সকাল বেলা সকলেই সিমলা চলিয়া গিয়াছেন।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—হঠাৎ সিমলায় যাওয়ার কারণ কি? কাল ত সে সম্বন্ধে কিছু শুনিনি?

সে বলিল—কাল রাত্রে আমি চলিয়া যাওয়ার পর দাদাবাবু কর্ত্তার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া সিমলা যাওয়া স্থির করেন।

আমি তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম না। কি হইয়াছে সমস্তই অনুমান করিয়া লইলাম। বুঝিলাম কাল রাত্রে আমার সঙ্গে সুষমার যা কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহা তারা টের পাইয়াছেন অথবা সুষমার মুখ হইতে হয় ত তাহা জানিয়া লইয়াছেন। ব্যাপারটা যাতে আর অধিক দূর গড়াইতে না পারে, সেই জন্যই সময় থাকিতে সুষমাকে আমার নিকট হইতে দূরে রাখিবার জন্য পরামর্শ করিয়া তাকে সরাইয়া ফেলিয়াছেন।

আমি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিলাম। সম্মুখে তখন সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। মেঘে মেঘে রং লাগিয়া সমস্ত পশ্চিম আকাশ লাল হইয়া গিয়াছিল। দেখিয়া মনে হইল এ যেন আমারই সদ্য-আহত সুখ-বিহঙ্গের বুকের তাজা রক্ত। চোখ ফিরাইয়া লইলাম। তারপর সোজা বাড়ী আসিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া বিছানায় মুখ গুজিয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

নি রা লা য়

অনেকদিন চলিয়া গিয়াছে। জীবনের স্রোতে পড়িয়া তারপরে আমাকে নিকটে দূরে অনেক স্থানে অনেক রকম লোকের সংসর্গে আসিতে হইয়াছে। ভাল মন্দ অনেক রকম লোক দেখিয়াছি, সুখের দুঃখের বহু প্রকার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছি। মনের যে উন্মাদনা এক সময় ছিল তাতে অনেকটা ভাটা পড়িয়াছে। যে সকল স্বপ্ন একদিন অতি যত্নের সহিত পোষণ করিতাম সংসারের খরদাহে সে সমস্ত পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। জীবনের এই ভস্ম রাশির মধ্যে শুধু একটী স্বপ্ন-বল্লরী এখনো সবুজ পাতা মেলিয়া বাঁচিয়া আছে। বহু ঝড় ঝঞ্ঝায় অনেক সময় তাহা অতি প্রবল ভাবে আন্দোলিত হইয়াছে, কিন্তু একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় নাই। সারাদিনের কাজকর্ম্মের পর যখন ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসি,—চেয়ারটা টানিয়া লইয়া জানালার ধারে বসিয়া যখন চারিদিকে তাকাই, যখন আমার চারিদিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে আর সেই অন্ধকারে পৃথিবীর চেহারা ঢাকা পড়িয়া যায় আর আকাশের চেহারা খুলিতে থাকে, তখন এই স্বপ্ন-লতা হইতে এক অপূর্ব্ব আঘ্রাণ ভাসিয়া আসে আর সেই আঘ্রাণে আবিষ্ট হইয়া আমি শুধু ভাবিত থাকি—কোথায়? সে এখন কোথায়?

এই লেখকের লেখা

দোআঁশলা (যন্ত্রস্থ)